প্রকাশনাসূত্র ও লেখকের কৈফিয়ৎ

পাঠকের কাছে সকল লেখার প্রকাশনাসূত্র জানান দেয়ার দায়িত্ব লেখক বোধ করেন। কারণ লেখক নিজে এই তথ্যের অনুসন্ধান করেন পড়ার কালে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষিত না থাকায় নিশ্চিত কোনো বার্তা দেয়া সম্ভব হলো না। তবে এই সংকলনের গল্পগুলো এক বা একাধিক প্রকাশিত হয়েছে যেসব জায়গায় তা হলো: *কবিসভা গদ্য সঞ্চালন*, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *কথার* একাধিক সংখ্যা, সাপ্তাহিক *একতা*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ-জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যুভেনির। এর বাইরেও ২/৩টা গল্প অপ্রকাশিত ছিল এই গ্রন্থপ্রকাশের আগে।

লেখক পরিচিতি

মানস চৌধুরী গল্প লিখতে শুরু করেছেন প্রবন্ধের থেকে এর প্রকাশনা সহজ হতে পারে এই ভেবে, ২০০২ সালে। প্রথমে সেটা মনে হলেও পরে আর প্রকাশনা সহজ মনে হয়নি তাঁর। লোকের সঙ্গে আলাপ করেও খুব ভাল তিনি বোঝেন না কীভাবে দৈনিকে কিংবা পুস্তকে প্রকাশককে রাজি করানো সম্ভব। এরই মধ্যে লিখে শেষ করার ৪ বছর বাদে তাঁর পয়লা গল্পগ্রন্থ *কাকগৃহ* প্রকাশিত হয়, ২০০৮ সালে, পাঠসূত্র থেকে। সম্পূর্ণ প্রস্তুত দ্বিতীয় cvÊwjwc 4 eQi AcKwkZ _vK‡j I B‡jKUwbKfv‡e cKwkZ n‡q‡Q| জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা তাঁর পেশা। পাশাপাশি সংবাদ-আলোকচিত্র ও মিডিয়া অধ্যয়নে লম্বা সময় পড়িয়েছেন। বিদ্যাজগতে তিনি মোটামুটি প্রকাশিত লেখক।

আয়নাতে নিজের মুখ

টুকরো গল্প

মানস চৌধুরী

[ডিসেম্বর ২০০৮]

ব্রাত্য রাইসু
সিউতি সবুর

নির্বাণ

যে মানুষটাকে নিয়ে ছোট এই গল্প সে নিরন্তর দাঁড়িয়ে থাকে জানালার পাশে। ওপাশে অস্থির পাখিরা তবু শান্ত, নানা ভাবে পাখার ঝাপটানি আর উড়ে বেড়ায়। যখন থামতে চায়, ন্যুব্জ এক সজনে গাছের ডালে এসে বসে, কিংবা তার পাশের কৃষ্ণচূড়ায়। কিন্তু লোকটাই কেবল দাঁড়িয়ে থাকে। আর যখন থামতে চায় ছোট্ট ঘরের মেঝেতে পুরোনো রঙ ওঠা টিনের বাক্স খুলে বসে। নানা মাপের কাগজ, নানান বয়সী, রঙ উঠে যাওয়া সব কাগজে ঘন হাতের লেখা – সে সেগুলো নিয়ে বসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আর বিড়বিড় করে আওড়ায় কিছু, গভীর মনোযোগ দিয়ে চল্‌টা ওঠা ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর ছাদের টিকটিকিটা তখন দৌড়ে পালায়, আর মাঝে মাঝে মাদুরের ওপর বুকের নিচে রোঁয়া ওঠা তুলা ছড়ানো বালিশ গুঁজে কাগজ নিয়ে লেখে, আর সেগুলো বিড়বিড় করে পড়ে। এগুলো করে আবার জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আর কিছুতেই থামতে পারে না। জানালা থামলে মেঝে আর ছাদ আর কাগজ আর টিকটিকি, কাগজ থামলে জানালা আর পাখি আর সজনে গাছ। এই এক জগত, ঘূর্ণায়মান জগত তার।

কখনো কেউ কি বলতে পারবে লোকটা বাজারে গেছে কিংবা আর কোনো জনপদে? পারবে না। কারণ কেউই লোকটাকে কোথাও দেখতে পায় না, লোকটা নিজেও তাকে কোথাও দেখতে পায় না। খালি সজনে গাছটা তাকে মনে করিয়ে দেয় হতে পারে তুমি এখানে আছো – আর কোথাও নও, ন্যুব্জ কিন্তু পাখিদের বাসা।

এইভাবে বহুদিন কেটে গেলে পরে একদিন রাত আসে। সেই রাতেও জানালা ছিল, কিন্তু সজনে আর পাখিদের ভিড় নাই, কেবল জ্যোৎস্না ধূ ধূ জ্যোৎস্না। রূপোর সাথে আলতা মেশানো জোছনা আর লোকটা জানালার সামনে। তারপর থামতে চাইলে মেঝেতে এসে বসে, আর সেই টিনের বাক্স, আর টিমটিমে একখানা হারিকেন। এমনি সময় দরজায় টোকা। হয়তো এই প্রথম সেই দরজায় টোকা। কিন্তু লোকটাকে বিচলিত মনে হয় না, খানিক ক্লান্তি আর খানিক উত্তেজনা মাখা চোখে দরজা খুলে দাঁড়ায়।

দরজার দু'পাশে তখন দু'জন মানুষ। ওদের অভিবাদন ছিল আয়নার মত, আয়নায় যেমন মানুষ একা হাসে – স্মিত আর সুন্দর ঠিক তেমনি। আর আগন্তুক ভেতরে এসে যায়। কেউ কি দেখেছে কাউকে? কিন্তু লোকটাকে তো জনপদে দেখতে পায় না কেউ! এরপর হারিকেনের টিমটিমে আলো আর বুকে শুয়ে দু'জন মানুষের টিনের বাক্স খুলে বসা, বিড়বিড় করে পড়ে চলা, আর থেমে জানালার পাশে পাশাপাশি, আর রূপালি আলতার জোছনা। এইভাবে রাত বেড়ে গেলে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝরাতে জোছনার তোড় বেড়ে যায়। আর লোকটা মানে পুরোনো লোকটা, যে লোকটা আগন্তুক নয়, টিনের বাক্স খুলে বসে, তারপর উপুড় করে কাগজ ছিটায়, খালি বাক্সে একখান কাপড় আর সাদা কাগজ আর কলম ভরে, আস্তে আস্তে পা টিপে বাক্স নিয়ে দরজায় যায়। আলতো ঘাড় ঘুরিয়ে পরম স্নেহে সে তাকায় আগন্তুকের দিকে, তখন সে গভীর ঘুমে। সিঁড়ি বেয়ে রূপালি আলতার জোছনায় মিশে যায় লোকটা।

পরদিন আবার সকাল হয়। চেনা জানালার পাশে সজনে গাছ আর অস্থির শান্ত পাখিরা আর জানালায় আগন্তুকের মুখ, তখন আর সে আগন্তুক নয়। বহুকাল এই ঘর চেনা হয়ে গেছে তার। সে জানালায় দাঁড়ানো থামাতে চাইলে মেঝেতে তুলো ছড়ানো বালিশ বুকে গুঁজে ছিটানো কাগজ নিয়ে পড়ে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে ছাদের দিকে চায়, টিকটিকিটা দৌড়ে পালায়, আর সে কলমটা খুঁজে চলে কিছু একটা লিখবে বলে। বাইরে পাখিরা উড়ে চলে আর থেমে সজনে গাছে বসে।

(ডিসেম্বর ৩, ২০০১)

প্রকাশ: *কথা*, প্রথম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ২০০৪

ভরা খাম

ওপারে কেউ কি কখনো মায়ার আবেশে ভেসে যেতে যেতে, সম্মোহনী ইশারার হাতছানিতে ঘুরপাক খেতে খেতে তাকায় না? তাকায় তো! ওপারে মানুষ ওভাবেই তাকায়। অন্তত কেউ কেউ তো তাকায়ই। নইলে ওপারে আর কিভাবে তাকাতে পারত তারা? টলটলে নদীর পানি যেবেলা বাষ্প হয়ে দৃষ্টির সমুখে ভাপানো কাঁপানো পর্দা তৈরি করে – সেরকম সময়ে ওপারে মানুষ তাকায়, আর আচ্ছন্নতায় ডুবে যেতে যেতে, আর ভেসে যেতে যেতে আর ঘুরপাক খেতে খেতে আবারো তাকায়, আবারো তাকায়। নদীর সম্মুখে, নদীর ওপারের সম্মুখে মানুষের বিপন্নতায় সেরূপ তাকাবার রীতি।

কিন্তু জগতে কত অসীম ওপার থাকে! কত অনন্ত! সবগুলোর কি হিসাব থাকে? থাকে, কিংবা থাকে না। নদীর ওপারের হিসাব থাকে। জন্মে থাকে, আবার জন্মান্তরেও থাকে। এই হিসাব আর তার স্মৃতি মানুষের, মানে কিছু কিছু মানুষের, জন্ম-জন্মান্তরের। কিন্তু ওপার যখন পরপার – তখন কী হয়? যে হিসাব অন্তহীন, যে পর্দা এমনকি ভাপানো-কাঁপানো হয়েও দেখা দেয় না তার সম্মুখে পড়ে মানুষ। সে ভীষণ শক্ত পরিস্থিতি। ফলে এখন, সে খুশি হয়। ভারী খুশি হয়। ছোট্ট কাঠের কুঠুরীটার পাশে দাঁড়িয়ে বিপুল বিপন্নতার মধ্যেও সে খুশি হয়। সবচেয়ে শক্ত ওপারের দিকে সে তাকিয়ে নেই। তার খানিক উত্তেজনাও লাগে, বিপন্নতার পাশাপাশি।

আর উত্তেজনার সূতোগুলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলে ছোট্ট ওই কাঠের কুঠুরীটা আরো ঘন রহস্যময় হয়ে ওঠে। বিপন্নতাটার সেভাবেই পুনরুত্থান ঘটতে থাকে। আর সেই রহস্যময়তা জড় বানিয়ে রাখে তাকে, যে বিশেষ মানুষটার গল্প এটা। কাঠের কুঠুরীর খোলা মুখে আলতো এককোণা মুখ বের করে থাকে বাদামী খয়েরী খাম। কিন্তু নিয়তি হলো উত্তেজনার সূতাগুলো মিলিয়ে যাবেই। পরপারকে ওপারে না দেখার উত্তেজনা; আর বিশেষভাবে এই বাদামী খয়েরী খামের আলতো করে মুখ বের করে থাকার উত্তেজনা।

কাঠের কুঠুরীগুলো কেবল মুখখোলা রেখে ইশারা দিতে জানে। ওটুকুই। নইলে কিভাবে এই ওপারে তাকানোর নেহায়েৎ নিমিত্ত হয়ে থাকে? আপাতত নিমন্ত্রণ আর ইশারার এক জটিল সন্ধিক্ষণে ওই কাঠের কুঠুরীখানা। যেখানে বাদামী খয়েরী খামেরা বাস করে। বাস করে কিন্তু থাকে না। থাকে, আবার এই হঠাৎ থাকে না। হোটেলের মত। সবসময়েই আসা যাওয়ায় থাকে। কেবল বড় একটা অমিল। হোটেলের নিবাসীরা হোটেলের অবসানেও থাকে। অন্য কোথাও থাকে, কিংবা অন্য কোন হোটেলে। কিন্তু কাঠের কুঠুরীর বাসিন্দারা আর কোথাও থাকে না। কুঠুরী ছেড়ে গেলেই নিবাসহীন হয়ে পড়ে তারা – ওই বাদামী খয়েরী খামেরা। নিমন্ত্রণ কিংবা ইশারার অবসান ঘটে। কিংবা কেজানে! হয়তো হোটেলেরও তাই। এই এতসব কিছু কাঠের কুঠুরীগুলো জানে না। তাই অবিচল স্থির হয়ে ওপারে তাকানোর নিমিত্ত হয়ে থাকে সেটা – চিঠির বাক্সখানা।

সে, মানে মানুষটা, তাই বাক্সটার নিয়তি নিয়েও ভাবে। কেবল খানিকক্ষণ। তারপরই সে আবার বিপন্নতায় ফেরে। তবে কি সে আকাঙ্ক্ষিত আসবে? তবে কি সে আসবে না? এই কাঠের কুঠুরীতে থাকা বাদামী খয়েরী খামের শরীর বড় ভারী। ভারী শরীরের খামেরা কী বার্তা বয়ে আনে? একটা ছোট বাক্যই তো যথেষ্ট। অমুক তারিখে আসছি। আকণ্ঠ অপেক্ষায় ওই বাক্যটাই ঘুরেফিরে বারবার নিদারুণ পাঠ করা যেত। সকালের আধাঢোকা আলোয় একবার ঘুম থেকে উঠে। আবার সন্ধ্যেবেলার মশা আর অবসাদে ঘোলাটে চোখে আরেকবার। কিংবা রাতে বিছানায় শুয়ে থাকা বিদ্যুতের আলোয় আরো একবার। তারপরই তো একদিন সেইদিন চলে আসত। আসত না? ওপারে তাকানোটা তখন একখানা স্থির রহস্যময় কাঠের কুঠুরী ভেদ করে ছোট্ট কাগজখানায় ফুরফুর করে উড়ত। সেই নদীর ভাপানো-কাঁপানো পর্দার মত। ঝালরের মত দুলত, কাগজের মত উড়ত। অথচ এই কাঠের কুঠুরীখানা এখন ওপারের নিমিত্ত মাত্র।

ওপার থেকেও ভরা খামখানা ঘরের ভেতর ঢোকে। মেঝের মাদুরে উন্মোচিত হয়। সেই ভরে থাকার অন্তঃসার আর ওপারে থাকে না। ভেতরের ভরারা বাইরে এসে লীন হয়ে যায় – বাতাসের থেকেও মসৃণ, বাতাসের থেকেও ক্ষীণ, দুরকায়া, কুঠুরীর থেকেও স্থির। ওপারে কেবল

তখন থাকে সেই মানুষটি – চাইলেই যে ফুরফুরে ছোট্ট একখানি খাম পাঠাতে পারত। কিন্তু সে তো তা পাঠায়নি। পাঠিয়েছে ভরা এই খাম। ফলে সে, যে শুয়ে বসে ফুরফুরে কাগজখানি না দেখতে পারার বিপন্নতায় কুঠুরীর সামনে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থেকেছে, এখন মাদুরে বসে ওপারে তাকিয়ে আছে। আর ওপারে তখন পরপারের ছায়া, আদি নেই অন্ত নেই, আশা নেই ভরসা নেই। ধূ ধূ মায়াকাল। বহু পুরাতন প্রিয় একখানি বই, আর তার পাশে ছোট একটা চিরকুট 'যাওয়া তো হলো না। কখনো হবে সে ভরসা কিংবা আগ্রহ কোনটাই নাই। প্রিয় বইটা পাঠালাম। ভাল থেকো।'

(৩১শে মে, ২০০৩/শ্যামলী)

শবযাত্রা

দীর্ঘ, অগণ্য – যেন এ মিছিল শেষ হবার নয়। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, ধুন্ধুমার বার্তা ছড়ানোর উৎসব। বার্তা ছড়াতে থাকে মুখে মুখে, পায়ে পায়ে। অনন্ত পায়েরা চলতে থাকে। তবু বিক্ষিপ্ত হয় না। ছড়াতে থাকে বার্তা আর চলতে থাকে পায়েরা। মিছিল তবু অটুট থাকে – সংঘবদ্ধ, সারি সারি, নিশ্চিত গন্তব্যমুখী। যা কিছু বিচলন তা কেবল নিছক দর্শকের। যে দর্শক দুরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুতেই সামিল হয় না। অথবা এই নিশ্চিত গন্তব্যের অভিযাত্রায় সামিল হবার তার উপায় নেই। নেহায়েৎ নিরুপায় সে। এ তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা উর্ধ্ব প্রসঙ্গ। নিজ অস্তিত্বভারে কিংবা নিজ অস্তিত্বদোষে সে থাকে আটপৌরে, বিযুক্ত আর অনৈচ্ছিক দর্শক। যদিও, সে ভেবে দেখেছে, ইচ্ছা একটি লৌকিক প্রসঙ্গ এবং এই শ্লোকগাঁথার মত ঘন আবিষ্ট এক যাত্রায় সামিল হওয়া অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা নয়; তথাপি, বিযুক্তিই নিয়তি। তাই সম্ভাব্য বিচলনকে যুঝতে হয় তার। একটা শবযাত্রার কেবল দর্শক হবার দায়ও গুরুভার মনে হয়। ফলে তার দাঁড়িয়ে দেখতেই হয় সম্মুখে চড়াই। সে দুরারোহ চড়াই রহস্যের মত করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তার। সেই খাড়া চড়াইও এই মিছিলের ছন্দকে ম্লান করে না। কেবল অকস্মাৎ খোদ শব তাকে সেই খাড়ির রহস্যময়তায় মায়াবী জিজ্ঞাসায় কাতর করে দেয়। নিরাভরণ শবের পিঙ্গল কিংবা রেশমী খয়েরী পাখা তখন শরীরের ভাঁজ-আলগা হয়ে। তার উত্তরীয় যেন। যেন আরেকবার ইচ্ছে হলেই উড়ে যাবে সে। কিন্তু সেই ইচ্ছে তখন অলীক। নিস্তরঙ্গ পাখা তার – সে অবধি খাড়ি বেয়ে উলম্ব হয়ে ওঠে। মিছিলের চূড়াভাগে বসে বা শুয়ে খাড়ি বেয়ে ওঠে – উলম্ব। শবেরা সাধারণত উলম্ব হয় না। হতে নেই, কিংবা অভিযাত্রীরা কর্তব্য-বিবেচনায় অনুভূমিক করে রাখে। উলম্ব শবের পক্ষে মায়াবী জিজ্ঞাসায় দর্শককে কাতর বানানো সহজ। কারণ, শবের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয় তখনই। অকস্মাৎ।

কিন্তু আরো বড় সত্য হচ্ছে, শবেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে নেই। ফলে এক নতুন জিজ্ঞাসায় আপতিত হয় দর্শকটি। শবের সঙ্গে চোখাচোখি তার এক বিভীষিকাময় আত্মোপলব্ধিতে অবগাহনের সূত্রপাত। তাহলে, এই যে সে অনৈচ্ছিক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে মহামিছিলের অভিযাত্রা দেখছে, আর

সামিল না হওয়াই তার নিয়তি, এই শবের সঙ্গে তার বিভেদটা কোথায়? চড়াই বেয়ে উঠতে থাকা রেশমী খয়েরী নিস্তরঙ্গ ডানা তাকে রোমশ একটা ঝাপটা দিয়ে যায়। আর সে গ্রেগরির মত স্তম্ভিত হয়ে মুহূর্তের জন্য কাফকাকে নিয়ে ভাবে। তারপর আবার ক্রমান্বয়ে মিছিল, মিছিলের অনন্ত পা, অগণ্য যাত্রী আর উলম্ব শবকে নিয়ে ভাবতে বসে। বিচ্ছিন্নপ্রায় শবের একটি পা মিছিলযাত্রীরা নিবিড় যত্নে সমন্বিত রাখবার চেষ্টায় কসরৎ করে চলে। ঘন মিছিলটি অটুট থাকে, আর একটি অটুট শবদেহ গন্তব্যে পৌঁছাবার আকুতি নিয়ে সচল থাকে।

অতলান্ত বিস্তরণশীল বিভীষিকায় স্নাত হয়ে দর্শকটি তখন গ্রেগরিকে ভুলতে বসে। শবের রোমশ ডানার ঝাপটায় যদিও গ্রেগরির কথাই তার প্রথম মনে আসে। সেই থেকে লক্ষ-কোটি পিপীলিকার সারি তার হাত বেয়ে, পা বেয়ে ওঠানামা করতে থাকে। তার কানের গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করে, মস্তিষ্কে বিচরণশীল হয়, আবার কানের গহ্বর থেকে বাইরে আসে। তার শরীরের প্রতিটি কপাট তখন পিপীলিকারাজির জন্য উন্মুক্ত। তখনই রেশমী খয়েরী পাখা তার আলগা হয়ে আসতে চায়। সে সচকিত হয়ে, বিচ্ছিন্নতার ভয়ে, ডান পা-টা ঝাড়া দেয়। সেটা খুলে আসে না, অটুটই থাকে। কেবল নিহত আরশোলার শুঁড়ের মত নিস্তেজ ঝুলতে থাকে। এ প্রসঙ্গেই তার মনে হয় ইন্দ্রিয় আর চৈতন্যের কথা। যদিও চৈতন্য ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বসবাস করে কিনা এ দ্বন্দ্ব তার পুরোনো। এই শবযাত্রা অবলোকনের বহুকাল আগে থেকে। ইন্দ্রিয়ের সাড়া সে পায় না। প্রথমে জিভ দিয়ে সম্মুখের দেয়ালখানা চেটে দেয়, যেটা চড়াই হয়ে সম্মুখে ছিল তার। কেবল শক্ত কাগগে-ঘষা এক শব্দ। আর তার কানে এক নৈঃশব্দের কালের মধ্যে পিপীলিকার কোটি পায়ের আসা-যাওয়া – কেবল বুদ্ধি দিয়ে বোঝে সে, কিংবা চৈতন্য দিয়ে। অতীত শৈশবের মত এরপর সে জননকেন্দ্রে হাত দেয়। নিস্তরঙ্গ হাত, আর নিহত আরশোলার থেকেও গভীর শব জননকেন্দ্রটি। শুঁড়ের কথা তার মনে পড়ে, আবার। শবের শুঁড় আধভাঙ্গা দেখেছে সে, কোন সঞ্চালনহীন। দেখেছে শবযাত্রায়, যেটা এই ক্ষণকাল আগে চড়াই বেয়ে তার দৃষ্টির অন্তরাল হয়েছে।

ফলে এখন সে শবের অটুটতা নিয়ে ভাবতে বসে। দর্শকটি এক ইন্দ্রিয়হীন রাজ্যে পিঁপড়ার পিঠে কিংবা মুখে শব হয়ে গন্তব্যে চলেছে এবং দৃষ্টির অন্তরাল। ভাবনা তখন রাজ্য-পরিসীমা ও লোক-পরিসীমা উত্তীর্ণ। পিঁপড়ারা প্রতিপক্ষের শবকে এহেন অখÉতা প্রদান করে কেন – এহেন মর্যাদা, গাম্ভীর্য আর যৌথতার উৎসব-চিহ্ন? এই শবটি কি তার সারাজীবনে এটাই সবচেয়ে বড় সম্মিলনের সম্মান পেল না? যদিও জীবন এখন অতীত তার – এই শবের, এই আরশোলাটির। অথচ পিঁপড়ারা স্বজাতিভক্ষণ করে! করে কি? দর্শকটি, সত্যিকার অর্থে সে এখন দর্শক নয়, এমনকি শব হয়ে গেছে, মনেপ্রাণে একজন জীববিজ্ঞানী বন্ধুর নাম স্মরণ করতে চেষ্টা করে। হয়তো পিঁপড়ারা স্বজাতিভক্ষণ করে! মানুষেরা করে না। পিঁপড়াদের জীবনে শবের প্রভেদ নেই – স্বপক্ষের কিংবা প্রতিপক্ষের। গাঢ়তা, মিছিল আর সম্মিলন, আর অভিযাত্রা তার প্রাপ্য। এই রীতি তাদের। শরীরের সমস্ত ভার পিঁপড়াদের শরীরের ওপর ন্যস্ত করতে করতে সে অন্তিম প্রশ্নে উপনীত হয়। কবে যে মানুষ রীতিমাফিক স্বজাতিভক্ষণ শিখবে?

(২৩শে মে, ২০০৩)

প্রকাশ: *একতা ??? কথা*, দ্বিতীয় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ২০০৫

শেষ ইচ্ছা

মানুষটিকে জিজ্ঞেস করা হলো: 'শেষ ইচ্ছা আছে কোন তোমার?' কিন্তু মানুষটি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধোবদনের খেলা করে। যারা এই মুখ দেখে না, কিংবা অধোবদন বলেই দেখতে পায় না, তারা সংকটে কাল কাটায়। কী আছে ওই মুখে? একি সম্মতি – হ্যাঁ শেষ ইচ্ছা আছে? কেবল শেষ ইচ্ছা জানাবার যে নিঃসীম প্রস্তুতি দরকার তা সম্পন্ন হয়নি! কিংবা ঐ মুখে আছে এক গভীর জ্ঞান যে জ্ঞান এক ভয়ানক আস্থার সাথে প্রত্যাখ্যান করে যাবতীয় নিমন্ত্রণ, বিশেষত নিয়ন্ত্রকের নিমন্ত্রণ। কিংবা ঐ মুখে আছে অসংখ্য ভাঁজ যে ভাঁজের পরতে পরতে নিদারুণ ভীতি। ভীতি যে এরপর কোথায় যাত্রাপথ, কোথায় মোড়; নাকি শেষ! সোজা রাস্তা হঠাৎ থেমে যেতে পারে কিনা এই জবাবহীনতার ভীতি। অথবা হতেও পারে ঐ মুখে আছে চরম হিংস্রতা, কিংবা ঘৃণা। এতটাই যে সামনের তামাম মানুষজন, অন্তত তার এই কালের নিয়ন্ত্রকেরা সব ছারখার হয়ে যাবে। ফলে এই মুখ না দেখতে পাওয়া মানুষেরা অস্থির কাল কাটায়, সংকটে ও উৎকণ্ঠায়।

যখন এই রহস্য, এই অধোবদনের খেলা অসহনীয় হয়ে ওঠে সামনের লোকজন তখন মানুষটির খেলা থেকে অব্যহতি চায়। ইশারায় পরস্পরকে দেখে তারা। তারা জানে এর থেকে পরিত্রাণ না নিলে এই খেলা একপেশে হয়ে যাবে। আর কিছুতেই যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়ে তারা এই দৃশ্যপটের মুখ্য রচয়িতা সেটা অটুট থাকবে না। এভাবে, তাদের পরস্পরের চোখের নির্বাক ভাষা ঘটনাটিকে আরো খানিক পাঠ করে ফেলে। যদি মানুষটা তার খেলা চালিয়ে যেতে পারে তাহলে খোদ দৃশ্যপট রচয়িতা হিসেবে তাদের কর্তৃত্ব চুরমার হয়ে পড়বে। স্তরবিন্যাসের কাঠামোর এই বিপর্যয় সহনীয় নয়। বিশেষত দৃশ্যপটের চাবিকাঠি যার হাতে এই বিপর্যয় তার নিতে নেই। ফলে ইশারায় কর্মবণ্টন হয়ে যায়। আর এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে দৃশ্যনির্মাতাদের একজন মানুষটির মুখের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়। এই আধো আলো আধো ছায়া পড়া মুখে তাকিয়ে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। স্ত রবিন্যাসের উৎকণ্ঠাটা তার চোখে এসে ভর করে। সে ঐ চোখ নিয়ে অন্য সকলের দিকে তাকায়। অন্য সকলে – তার সহকর্মীবৃন্দ, এই দৃশ্যপটের যৌথ রচয়িতারা – সেই চোখ দেখে একই রকম ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। কারণ, লোকটির চোখেমুখে তখন নিবিড় কৌতুকের এক মুচকি মুচকি হাসি। সেই হাসি কোন নির্মাতারই নিরাপদ চলতা, নিরাপদ মনোপ্রবাহ নিশ্চিত করে না।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নিশ্চিত হয় প্রশ্নটি আবার করা প্রয়োজন: 'শেষ ইচ্ছা আছে কোন তোমার?' অধোবদনের খেলার আর প্রয়োজন নেই – মানুষটি সেটা বুঝেছিল যখন একজন ঝুঁকে তার মুখ পড়ার চেষ্টায় নিমগ্ন ছিল। ফলে সে মুখ তুলে তাকায়। সেই মুচকি হাসি, এবং সম্ভবত গভীর সেই জ্ঞানও। 'বল, শেষ ইচ্ছা আছে কোন তোমার?' মানুষটার মুচকি হাসি সম্প্রসারিত হয়। এবং সে সামনের সকল দৃশ্যপট রচয়িতার মাথার উপর দিয়ে আধখোলা, বন্ধ আকাশে আর তার সামনে পাংশু, ধুলোলাগা গাছের মাথায় তাকিয়ে থাকে। এরপর হাসি থামিয়ে সে, নিঃশব্দ, চোখ নিবব্ধ করে সম্মুখের মানুষগুলোর দিকে তাকায়। আরো কয়েক সেকেন্ড ধরে মুচকি হাসির জালটা, যে জালে সামনের মানুষগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে, সেটা গুটিয়ে আনে। তারপর আলতো হাসিতে ভেজা গলায় বলে, প্রায় মন্ত্রের মত: 'ইচ্ছা কি কখনো শেষ হয়? কেবল নির্মাতাদের নির্মাণকাজ শেষ হয়। দৃশ্যপট রচয়িতাদের দৃশ্যপট রচনা শেষ হয়। আপনাদেরও যেমন হবে।'

সেই উৎকণ্ঠার হিমধরা ভাবটা সামনের সকলের পেয়ে বসে। সবাই এ ওর দিকে তাকায়। নিবিড় এক পরাস্তবোধ তখন গ্রাস করে তাদের। এই পরিস্থিতি থেকে আবারও পরিত্রাণের প্রসঙ্গ আসে। ফলে একজনকে ভেঙে বলতেই হয়: 'দেখ, আমরা তোমাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমরা তোমাকে নির্বাসনও দিতে পারি। আর তুমি জান...তুমি জান যে নির্বাসন মানে বেঁচে থাকা; আর মৃত্যু মানে কিছুতেই বেঁচে থাকা নয়। তার মানে, তোমার শেষ ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে। তুমি অবশ্যই চেয়েচিন্তে নির্বাসন নিতে পার। তোমার জীবন তুমি রক্ষা করতে পার।' একদমে কথাগুলো বলে সে নেতৃত্ব দিতে পারার প্রশান্তি নিয়ে অন্যদের দিকে ফিরে তাকায়।

আর হিমরাজ্যের লক্ষ পতঙ্গা মানুষটার পিঠ বেয়ে, গা বেয়ে, শরীর বেয়ে, শরীরের রক্তপ্রবাহ বেয়ে নামতে থাকল, উঠতে থাকল। আর সে ঘেমে নেয়ে উঠল। তার মুখের মুচকি হাসি নির্বাপিত। সকলে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা বেয়ে তার দিকে তাকায়। মুহূর্তেই তারা রচয়িতার কর্তৃত্ব ফিরে পায়। এই ঘামা-নাওয়া চেহারা তাদের অতীব পরিচিত। তারা, প্রায় সমস্বরে, বলে ওঠে 'হ্যাঁ, বল, শেষ ইচ্ছা আছে কোন তোমার?' মানুষটার মনশ্চক্ষে তখন নিঝুম দ্বীপের ভোমরা রাখা কৌটাটা দাঁত কেলিয়ে হাসতে থাকে। সে শতসহস্র বছর সেই ভোমরার উদ্ধারকারীর খোঁজ করতে থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। আকাশের দিকে ঘাড় তুলে চাঁদের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে – সেই বুড়িটার লোভে, শৈশবে যাকে সেখানে আমানত রেখেছিল। চাঁদ তখন কোথাও নেই। ফলে নিরাশ মুখে আবারো তার হাসি আসে না। সে সংঘর্ষ চালিয়ে যায় তার মুখমÊলের সঙ্গে – যাতে একচিলতে মুচকি হাসি ফিরে আসে। অভিমন্যুর মত সে ঘেরাও হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর্তনাদের মত বলে: 'না, শেষ ইচ্ছা আছে তো।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল!'
'কিছুতেই নির্বাসন নয়। আমাকে মৃত্যুই দিন।'

(১লা, ২রা জুন ও ৩রা জুন ২০০৩/শ্যামলী)

নির্বাসন

অতঃপর নির্বাসনই হলো তার। কারণ, নিয়ন্ত্রকেরা জানতেন মৃত্যু এবং নির্বাসনের মধ্যে তার অধিকতর পছন্দ মৃত্যু। এবং কিছুতেই তার অধিকতর পছন্দের অভিযাত্রায় তাকে যেতে দেয়া যায় না। উল্টাভাবে, মৃত্যু তার অনায়াস লক্ষ্য। কারণ, সে জানে সেটাই যাত্রার শেষ বিন্দু, আর শেষ-বিন্দু-জ্ঞাত যাত্রার কোন অনিশ্চয়তা নেই। সেই নিশ্চয়তায় যাত্রা, সেই অনিশ্চয়তা থেকে পরিত্রাণ সে আকাঙ্ক্ষা করেছে। আর তাই সেই আকাঙ্ক্ষায় কোন প্রকার সহায়তা দেয়া দৃশ্যপট রচয়িতাদের কর্তব্যবিরোধী ঠাহর হলো। ফলে যদিও তাকে মৃত্যু দেবার বাঞ্ছা নিয়ে দৃশ্যপট রচয়িতারা সমাগত হয়েছিল, এবং নেহায়েৎ তার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুকে ঘিরে, তাই উভয়পক্ষের এই বিরল ঐক্য সত্ত্বেও তার নির্বাসন হলো, মৃত্যু হলো না।

প্রতিটি নতুন দিন নির্বাসনে গুণতে হয় তার। সেটা নির্বাসনের মেয়াদ হিসেবের জন্যে নয়। সেই ইচ্ছেটাও তার খুব প্রগাঢ় নয়। প্রতিটি নতুন দিন তার গুণতে হয় কারণ সেটাই নির্বাসনের সাধারণ রীতি। আসলে গুণে গুণেই কেবল বোঝা যায়, নির্বাসনে, যে দিন নতুন হয়েছে। ফলে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত খুবই জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু যাদের নির্বাসন হয়েছে কুঠুরীতে, কিংবা অন্য কোন অসূর্যস্পর্শ্য স্থানে – তাদের তাহলে নতুন দিন অনুভবের কোন উপায় তো নেই! অভ্যর্থনা যদি নাও থাকে। নির্বাসিত মানুষটা ভেবে চলে, আর হঠাৎ এই সত্যটি আবিষ্কার করে যে অসূর্যস্পর্শ্য নির্বাসিতদের থেকে সে নিতান্ত ভাল আছে।

কিন্তু এই ভাবনাচক্রটি তার এক জটিল গাণিতিক সমীকরণের মত নানা বর্ণসংকেতে ঘুরে ফিরে আসে। অথবা আসে না, কারণ সেগুলো মুহূর্তের জন্যও যায় না। ফলে এক আবর্তের ঘুরপাকে সেগুলো তার মাথাতেই থাকে। প্রথমে সূর্যের তাৎপর্য নিয়ে তার ভাবনাপ্রবাহ, অতঃপর ধীরে ধীরে ভালত্বের অর্থ নিয়ে সে আবর্তিত হয়। এই ভালত্বের নিগূঢ় অর্থ কী? কিভাবে এবং কেন নতুন দিন জরুরী! দিনেরা যদি পুরাতনই হয় কী এসে যায় তাতে! অথবা, দিনের একত্ব ও বহুত্বের কী এমন তফাৎ! নির্বাসিত

মানুষটি ভেবেই চলে, আর একটি জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়: জীবন কি কালীক? নির্বাসিত জীবনে এটিই তার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার, যেটি খোদ নিজেই একটা জিজ্ঞাসা।

আপাতত এই নবলব্ধ জিজ্ঞাসাটি তার একটা সন্ধিক্ষণে নিয়ে আসে তাকে। এই সন্ধিক্ষণটা থেকে সে অপেক্ষমানের কর্তব্য ত্যাগ করে। তার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা। তার প্রতিটি দিনের গণনা সারতে পারার অপেক্ষা। অপেক্ষাগুলো বদলে যায়। এক জটিল গাণিতিক সমীকরণ, একেবারে উল্টো, তাকে গণনার রাস্তা থেকে হাত ধরে নিয়ে আসে। আর সে অকালীক জীবনের গূঢ় খুঁজতে বসে – পেয়ে যাবে নিশ্চিত এই ভরসায়। ফলে তার স্মৃতি জাগরুক হয়। দৃশ্যপট রচয়িতাদের কথা তার মনে আসে। সেই রচয়িতারা, চাইলেই যারা নির্বাসনের বদলে তাকে মৃত্যু দিতে পারত। কিন্তু তারা দেয়নি। তারা বলেছিল: 'নির্বাসনের মানে বেঁচে থাকা, আর মৃত্যুর মানে বেঁচে না থাকা।' একটা মায়াবী হেঁয়ালীর মত মানুষটা আবিষ্কার করতে থাকে অপেক্ষার অপরাপর মানে। অপর অর্থ হলো এই যে, সেই দৃশ্যপট রচয়িতারাও অপেক্ষমান হয়ে আছে। অপেক্ষমান যে কিভাবে এই নির্বাসিত মানুষটা কাল বেয়ে চলে। নির্বাসিত মানুষটা মনশ্চক্ষে দেখতে পায় সেই মানুষেরা তাকে সরেজমিন অবলোকনে আসবে। পয়লাতেই তার নিষ্পত্তি করে নিতে হয় তার মস্তিষ্কের প্রতিশোধপরায়ণতার সাথে। কারণ এই বোধ আচ্ছন্ন করে রাখে। আর কিছুতেই দৃশ্যপটের রচয়িতা হতে দেয় না তাকে। কিন্তু সে দৃশ্যপটের রচয়িতাই হতে চায়। অন্তত একটা দৃশ্যপটের।

যদি নির্বাসনের অর্থ সুনিশ্চিত হয় কালান্তরে, তাহলে কালের কব্জা নেড়েই নির্বাসনকে উপড়ে ফেলা সম্ভব, কিংবা পাল্টে ফেলা – গণিতের সমীকরণের কাছে তাকে ফিরতেই হয়। ফলে এখন থেকে সে দিন থেকে দিনান্তরের গণনা বদলাতে শুরু করল। এবং একেকটি দিনে অনেকগুলো দিন ভরে দিতে থাকল। কিংবা একটা দিনকে টেনে নিয়ে গেল অনেকগুলো সাবেক মাপের দিনের কাছে। প্রতিদিন অজস্র সূর্যোদয় ঘটাতে থাকল, এবং অজস্র সূর্যাস্ত। আবার, খুব জটিলভাবে, কোন কোন সূর্যোদয় ঘটাবার পর তাকে আর সূর্যাস্তে না নিয়ে গিয়ে ক্রমাগত অনুমোদন করল। এভাবে নিতান্ত খাটাখাটনি করে সে কালের ব্যাকরণ নস্যাৎ করে দিল। আর পরম প্রশান্তিতে সে, জ্ঞানত, বসে থাকল কবে সেই মানুষগুলো আসবে তার জন্য – যেহেতু এখন আর তার অপেক্ষায় কাটে না। এখন এই কালান্তরের কব্জা নিয়েই তার কারবার। কিংবা সে নিরন্তর কালের শরবৎ বানিয়ে চলেছে।

এরপর কোন এক দিন তারা আসে। দেখতে আসে নির্বাসন প্রক্রিয়ার কোন লক্ষ্য অর্জন হলো কিনা। কোন্ দিন আসে সেটা সঠিক বোঝা যায় না, যেহেতু দিনের হিসাব তখন সমূহ জটিল। তবে তারা ঠিকই জানত দিনের হিসাব। নির্বাসিত এই মানুষটার সম্মুখে আসবার আগ পর্যন্ত। কিন্তু যেই না তারা নির্বাসনের পর্যালোচনা করবার জন্য নির্বাসিত মানুষটির সম্মুখে এসেছে, অমনি আসা-যাওয়ার হিসাব তাদের নির্বাপিত হয়। তারা সত্যিকার অর্থে, কালের ব্যাকরণবিহীন হয়ে স্মৃতি ও পরিমÊলের স্তূপের মধ্যে নিপতিত হয়। সঠিকভাবে তখন তাদের মনেও পড়ে না ঠিক কবে কখন কী অছিলায় তারা এখানে। এমনকি তারা যে দর্শনার্থী কিংবা পর্যালোচক সেই আপ্তজ্ঞানও তখন লুপ্ত। যেহেতু কালহীনতার মধ্যে স্মৃতি ও পরিমÊলের স্তূপ, ফলে স্তূপের ভেতর থেকে, নানাবিধ সংযোগে নির্বাসিত মানুষটির স্মৃতিও অর্জন করতে থাকে তারা, এবং আবার হীন হয়। এভাবে, কেবল এভাবেই, নির্বাসিত মানুষটির মুখের ভাঁজে আবার সেই মুচকি হাসি ফিরে আসে। নিশ্চিত দেখতে পায় তারা।

(৩রা ও ৪ঠা জুন ২০০৩/শ্যামলী)

লঞ্জন

শঙ্কা আর দ্বিধা কোনটাই পিছু ছাড়ছে না। আর জানালার পাশে থাকা চেহারাটা, সেই চেহারার মালিক লোকটা সেগুলো পুষে নিয়ে বসে। পুষছে কিন্তু হজম হচ্ছে না, হজম হচ্ছে না দুর্নিবার তার বাসনা এবং, সম্ভবত তাই, এই গভীর হঠকারী জিজ্ঞাসা 'কী হবে যদি সে অবাধ্য হয়!' কোথাও যে কিছু লেখা নেই সে তো জানা কথা। কিন্তু যদি লেখা থাকতও, এই লোকটার তাতে খুব একটা কিছু আসত যেত না। কারণ লেখ্য ফরমানগুলো সে কেয়ার করে না। লেখ্য ফরমানগুলোর সঙ্গে সে যোগাযোগও করে না। ধরা যাক, লেখা আছে 'হাত ভেতরে রাখুন'; লোকটা যে হাত ভেতরেই রেখেছে, অন্তত এতক্ষণ এই নিশপিশানির আগে – শঙ্কা ও দ্বিধার – তাই রেখেছিল, কোলের কাছে যেখানে ধুতি কিংবা পোটলা পাকানো লুঙ্গির কোঁচর, সেটা কিন্তু এ কারণে নয় যে লেখা আছে 'হাত ভেতরে রাখুন'। সে হাত ভেতরে রেখেছে কারণ জানালার বাইরে হাত রাখতে সে চায় না। জানালার বাইরে হাত রাখতে তার আরামও হয় না বিশেষ। কিংবা এই একটু আগে সে যে ভাড়া দিল ৩ টাকা ৫০ পয়সা, সেটার কারণও এই নয় যে সামনের রডঘেরা জায়গাটাতে অত্যন্ত ছোট একটা ফ্রেমে কাঁচবাঁধানো টাইপে লেখা আছে সেই ভাড়া। সে ভাড়া দিল কারণ, সম্ভবত, ইদানিং রোজদিনই, অন্তত সে বেরোলে, এই ভাড়াটা দিয়েই সে গন্তব্যে পৌঁছায়। অনুমান করা যায় কোন একদিন কন্ডাকটর এই ভাড়াটা জানিয়ে দিয়েছিল। এবং আরেকদিন এই ভাড়া বদলের, মানে বাড়াবার, কথা সে না জানালে পরের দিনগুলোতেও লোকটা এই ভাড়াই গুণে যাবে।

জানালার ওপারেই শাহরুখ খানের বিরাট পোস্টার আর লোকটা ইতস্তত চোখে সেই পোস্টার দেখছে। দেখছে আবার দেখছেও না, তার মন বন্দি সেই দুর্নিবার বাসনার সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে করতে। হতে পারে বাসের ড্রাইভারও সেই পোস্টারটিই দেখছে। নইলে এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোন কারণ থাকতে পারে না। বিশাল শাহরুখ। সত্যিকার চেহারার তিনগুণ, চারগুণ এমনকি পাঁচগুণও হতে পারে। কটাক্ষে পাশে তাকিয়ে। তীক্ষ্ণ তির্যক চাউনি। হয়তো পাশের নায়িকার দিকে তাকিয়ে। অত্যন্ত আলগোছে লোকটা একটা ত্যারছা চোখে পাশের লোকটার মুখের দিকে চেয়ে নিল। ততক্ষণে তাঁর ডান হাত ফতুয়ার ডান পকেটে ঢুকেছে। পাশের লোকটা এসব বিষয় লক্ষ্য করেছে বলে মনে হয় না। এতটাই অলখে সে যে তার পুষ্ট উরু ফতুয়া-পরা ইতস্তত লোকটার শীর্ণ উরু যে চেপে রেখেছে সেটাও তার মনে নেই। শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্ত লোকটা আরেকবার সেই উরুর দিকেও তাকিয়ে নেয়। কোন তির্যক চাউনিই তার শাহরুখের মত হয় না।

দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের একাংশ যখন ড্রাইভারের কর্মবিরতি নিয়ে সোরগোল করছে ঠিক তখনই লোকটা তার শঙ্কা আর দ্বিধার সঙ্গে আপাত নিষ্পত্তি ঘটিয়ে পকেট থেকে পাতাবিড়ির গোছাটা বের করে। কাঠবেড়ালের মত আরেকবার তাকানো সেরেই সে মুখে বিড়িটা ঝোলায়। গোছাটা পকেটে চালিয়ে সে সেখান থেকেই লাল রঙের দেশলাইটা বের করে, আর ঝোলানো বিড়িতে আগুন লাগায়। পাশের লোকটার, কিংবা বাসে যারাই দ্বিধাগ্রস্ত এই লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল তাদের সকলের, এই দৃশ্য ইতোমধ্যেই দেখে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কোন এক কারণে, কারণটা দুর্বোধ্য, সেটা তারা করেনি। অন্তত পাশের লোকটা তা করেনি। এতক্ষণ-দ্বিধাগ্রস্ত, এইমাত্র-বিড়ি-ধরানো লোকটা প্রথম ধোঁয়া ছাড়ার নিষ্পত্তিতে চোখ বুঁজে ফেলে। একটা পয়লা-কড়া গন্ধ মিষ্টিভাবে বাসের অন্যত্রও আসাযাওয়া করে।

পাশের লোকটা ঠিক তখনই এক গলায় শতকণ্ঠ জড়ো করে ফেলে। বাসের সমস্ত লোক চোখেমুখে পরম সম্মতি জ্ঞাপন করে। ফলে শাসনের ব্যবস্থাদি পোক্ত হয়। রায় হয়: 'যতসব ছোটলোক বাসে এসে ভিড় করে'। ফতুয়া-গায়ে লোকটা তখন বিড়ি হাতের তালুতে ঢেকে, শুকনো ঘাড়ে ঘাড় নিচু করে একটাও অন্তত সহানুভূতির চোখ প্রার্থনা করছে। কিন্তু এ এক অসম্ভব প্রত্যাশা। লঞ্জন কী সে জ্ঞান অবিমিশ্রভাবে সকলের লব্ধ। আর ফতুয়া-লাগে লোকটা তার দায় নিয়ে বসে। লোকটা কিছু আগের দ্বিধাকে পরম ভালবেসে জানালার বাইরে তাকায়। শাহরুখের পোস্টারের পাশে তখন দাঁড়িয়ে হিসি করছে এক লোক। লঞ্জনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে লোকটা তখন হিসি-করা লোকটাকে হিংসে করতে শুরু করল। আবার শঙ্কা। শাস্তিটা কতদূর যাবে!

(২৩ শে জুন ২০০৩/কোলকাতা)

ভালুকটা আমার পা চেটে দিয়েছিল

নিবাসের কাছাকাছি পৌঁছুতেই ভালুকটা কোত্থেকে দৌড়ে এসে আমার পা চেটে দেয়।

আমি তত ঘাবড়াই না। বা ঘাবড়ানোর থেকেও আমার স্বভাবদোষে ভালুকের পা-চাটা রহস্য নিয়ে নিবেদিতপ্রাণ গবেষক হই। আমার পড়শিরা হচ্ছেন সুশীল মানুষ। তাঁরা তাঁদের জানালা দিয়ে, কিংবা বৈকালিক হণ্টন-শেষে ফিরবার কালে ভালুকটার কসরৎ লক্ষ্য করলেন। আর যে যার জানালা দিয়ে, কিংবা আমার কাছ পর্যন্ত এসে বিড়াল জাতির লয়্যালটি ও গৃহপালিত মনোভাবের প্রশংসা করতে থাকলেন। তাঁরা বললেন: "বাহ্ আপনার বিড়ালটিতো বেশ! এত বছর ধরে আপনার পা-টা ঝামা ঝামা হয়ে গেল। কিন্তু ওর চাটাচাটির অভ্যাসটা একদম সতেজ ও নবীন হয়েই আছে।"

আমার রাগ হয়। মনে হয় বলি: "তা আপনারাই তো মনে হচ্ছে ওর প্রতি বেশি লয়্যাল। আমার থেকেও।" কিন্তু বলি অন্যকথা: "কিন্তু এটা তো বিড়াল না। এটা তো ভালুক।"

পড়শিরা আমার চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে বলেন। খুব আন্তরিক ও সুশীলভাবেই বলেন। তাঁরা স্মরণ করাতে ভোলেন না যে আমার নবুয়ত পাবার বয়স সমাসীন এবং বিড়ালকে ভালুক বলে ভ্রম হওয়া এই বয়সে মানানসই। বলাইবাহুল্য, ডাক্তারের কাছে যেতে আমি রাজি হই না। এমনিতে আমার বিড়াল বা ভালুক কোনোকিছুতেই বিদ্বেষ বিশেষ নেই। তবে ভালুককে বিড়াল বললে পেশাদারিত্বের সংকট হয় আমার। আমি তাঁদেরকে উস্কানি দেবার চেষ্টা করি যে তাঁরা হয়তো ভালুকের গৃহপালিত্ব যোগ্যতা কিংবা ধরা যাক পা-চাটার অধিকার নিয়ে কথা বলতে চাইছেন। তাহলে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা আলাপ তুলতে হবে। কিন্তু এরকম ডিফিনিশনাল সংকটে থাকলে তো কোনো আলাপ বৃথা। কিন্তু পড়শিরা বিশেষ বিচলিত নন। বরং, একথা বলায়, আমাকে ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য পীড়াপিড়ি করতে থাকেন। তাঁরা বলপ্রয়োগ করবেন না এই ভরসা আমার ছিল। কিন্তু তাঁদের পারসুয়েশন যোগ্যতা নিয়েও আমার সংশয় ছিল না। তাঁরা অচিরেই ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য আমাকে টার্গেট করে য়্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন প্রগ্রাম খুলে বসতে পারেন এই আশঙ্কা আমি বোধ করছিলাম। ডাক্তারের কাছে আমি যেতে চাই না। ফলে পরিত্রাণ খুঁজি।

এরই মধ্যে আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে ভালুকটা একটা বিরাট ডাক দিয়ে বসে -- "মিঁউউউউ"। বুঝলাম এতক্ষণ ভালমতো কথাবার্তা শুনেছে সে। এমনকি আমি আসার আগেই পড়শিদের সঙ্গে তার বোঝাপড়া হয়ে থাকতে পারে। ওর রিহার্সাল শেষ। তেমন কোনো ভরসা নেই বুঝতে পারি আমি।

ভালুক নিয়ে যত রহস্য আমার, পড়শিদের নিয়ে রহস্য তার থেকে ঢের বেশি। কী কাÉ! জলজ্যান্ত একটা ভালুককে এঁরা বিড়াল বলে চালিয়ে দিচ্ছেন?! ক'দিন এভাবেই ভুম মেরে থাকলাম। তদ্দিনে লয়্যাল ভালুক আমার ডিফিনিশন না পেলেও কনসেন্ট পেয়ে গেছে। প্রকৃতার্থে ওর জব ডেস্ক্রিপশন ভালমতো বোঝাবুঝি ছিল। পুরান বিড়ালটাকেও কোথাও দেখি না।

আসলে পড়শিদের ঠিক দোষ দেয়াও যায় না। এদ্দিন তাঁরা ভালুকরূপী বিড়াল মার্কেট করে এসেছেন। এবং অবশ্যই সেগুলোকে ভালুক বলেই চালিয়েছেন তাঁরা। এখন নীতিগতভাবে তাঁদের পক্ষে বিড়ালরূপী ভালুকটাকে মানা ছাড়া উপায় নেই।

ভালুকটা সেটা জানে।

এক মুহূত্রের জন্য যদি আমার পা বাড়িয়ে দেয়াতে একটু ইতস্তত দেখে সে অমনি বুঝে যাবে যে আমি তার বিড়ালত্ব মানি না। আমি যাই জানি না কেন, ধরা যাক সে বিড়াল না ভালুক, মনে হয় তা নিয়ে এটার সমস্যা নেই। প্রপারলি বিহেভ করলেই সব ঠিক থাকবে। ফলে আমার এখন কাজ হলো পা-টা স্মুদলি বাড়িয়ে দেয়া। যাতে গৃহ ও আমার প্রতি ওর যে লয়্যালটি ও দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটার অফিসিয়াল রেকর্ড অটুট

থাকে। আমি মুখস্তের মতো সেটা করা রপ্ত করি যাতে একদিনও ওর মনে না হয় যে আমি বিগড়ে গেছি।

আল্লা মালুম! সুশীল পড়শিদের সঙ্গে ওর কী কী নিয়ে পরিকল্পনা হয়!

(মোহাম্মদপুর, ১৪ মার্চ ২০০৮)

বৃষ্টি

– 'তোমার কি মনে পড়ে কোন এক কোলকাতার কবি লিখেছিল বৃষ্টি নিয়ে ... লিখেছিল যে বৃষ্টি এলে তার মনে হয় সেতুবন্ধ হচ্ছে তার সাথে তার প্রেমাস্পদের।'

– 'এমন ফটকা রোমান্টিকতা তুমি নাও কীভাবে?'

– 'ভালভাবে নিই না। বিশ্বাস করো। স্রেফ মনে পড়ল তাই বললাম।'

বলেই ছেলেটি হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে। 'ফটকা রোমান্টিকতা! বেশ তো!' ছেলেটি আওড়াতে থাকে কেবল। আর ওর হাসিতে কিছুতেই যোগ না দিয়ে পারে না সঙ্গীটি।

– 'সেতুবন্ধ নিয়ে এত গুরুগম্ভীর কিছু বলার দরকার পড়ে না। বৃষ্টিতে এমনিতেই নানারকম সেতুবন্ধ হয়। হবারই কথা। খাবার পানির সাথে গুয়ের পানিরও সেতুবন্ধ হয়।'

– 'এটা কেমন কথা?' আশ্চর্য হয় প্রথমজন।

– 'শুনতে খারাপ লাগছে তোমার? কিন্তু কেন? হয় না বলতে চাও? তোমার আমার হয় না। কিন্তু অনেকেরই তো হয়।'

এই কথায় ভাবান্তর হয় প্রথমজনের। ফলে সে থাই এ্যালুমিনিয়ামের কাঠামে লাগানো খয়েরি কাচের দিকে চেয়ে থাকে। বৃষ্টিরা সেখানে লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছে। কাচের গায়ে লেগে থাকা ধুলোরা ধুয়ে যাচ্ছে। আর একেকটা জলের ধারা ফিতাকৃমির মতো আকার নিয়ে নানারকম খেলা করে চলেছে। বাইরের পৃথিবীটা তখন দুরকায়া, ঝাপসা। ওধারের বাড়ির ব্যালকনিতে একটা দলছুট কাক আশ্রয় নিয়েছে। ওর চোখে সঙ্গীহীন ত্রস্ততা। এই আবছায়া খয়েরি কাচ ভেদ করেও তা বোঝা যায়। বাম পাশের উঁচু বাড়িটার ওপর তলায় ক্যাঁচক্যাঁচ করে জানালা খোলার আওয়াজ হয়। টয়লেটের জানালার মতো ছোট ছোট জানালা। কিছুক্ষণ আগেই ওগুলো বন্ধ করা হয়েছিল। এখন এই বৃষ্টির মধ্যেও আরেকটু বাতাসের লোভে আধখোলা করে দিতে চাইছে কোনো এক গার্মেন্টস শ্রমিক। জানালার পাল্লায় হাতটা দেখা যায়। হাতের মালিক মুখটাকে দেখা যায় না। ওর নাগাল পাবার চেষ্টা বলে দেয় জানালাগুলো ওর মাথার ওপরে। গার্মেন্টস কারখানায় এরকম

জানালা থাকে। হয়তো বৃষ্টি দেখতে গিয়ে কাজে ভাটা পড়বে এই দুশ্চিন্তা থেকে জানালাগুলো খাটো করে দেয়া। সামনের ত্রস্ত কাক ঘাড় কাৎ করে জানালার ক্যাঁচক্যাঁচ দেখে কিংবা শোনে। তেমন ভীতিকর কিছু না দেখে আবার বৃষ্টি থামবার প্রার্থনায় মগ্ন হয়। সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটার চোখে একবার চোখাচোখি হয়। কাকটি চোখ নামিয়ে নেয় বিব্রত অসচরাচর একাকীত্বে। ছেলেটির দিব্যি মনে হলো এই কাচ ডিঙিয়েও চোখাচোখি হয়েছে।

কাকটির সঙ্গে চোখাচোখি শেষ হলে ছেলেটি পাশে থাকা সঙ্গীর দিকে ফেরে। আর ফিরেই বুঝতে পারে এতক্ষণ সে তাকেই দেখছিল। তার মুখে কী ছায়া পড়েছে সে নিজে তা জানেনি। কিন্তু সেই ছায়ার প্রত্যুত্তরে এমন আর্ত, আর্দ্র চোখ আর অবয়ব সঙ্গীটির যে, সে নিজের মুখের ছায়াম্লান টের পেয়ে যায়। সেও সেবেলা চোখ নামিয়ে নেয়। পলাতক প্রসন্নতার বিব্রতিতে। বাইরে কিন্তু বৃষ্টি তখন পাগলা চালে ছুটছে। আর জানালার কাচে ফিতাকৃমির মতো অবয়বগুলো আরো ঘন আরো নিরন্তর ফুটছে। সামনের ব্যালকনিতে কাকটাকে এখন যেকোন পাখি মনে হয়। ওর অস্তিত্ব এখন নেহায়েত ছেলেটির জ্ঞানের ওপর ভরসারত। নইলে কাচ আর বৃষ্টি ডিঙিয়ে ওকে আর চেনা যায় না। ছেলেটি সঙ্গীর দিক থেকে কাচেই ফেরে তবু। আর শার্সিটা একপাশে সরিয়ে দেয় খানিক।

বৃষ্টিরা ছাঁটে ছাঁটে ঘরে ঢোকে। আর ছেলেটি কাকের সঙ্গে আরেকবার চোখাচোখি করতে চায়, এবারে নিবিড়। কোনো শব্দ হয়নি যদিও, কাকটি তবু শার্সিখোলা দেখল একপল। এবং আবার অধোবদন, ও টের পেয়েছে একটা চোখাচোখির আবেদন আছে এপারের জানালা থেকে। পাশের গার্মেন্টসটাতে খাটো খাটো জানালার আধখোলা পাল্লা থেকে নড়বড় করে দুলতে থাকা পাখাগুলো ঘুরতে দেখা যায়। আর কাকটা সেটা নিয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। আর ছেলেটি এভাবে দুটিমাত্র দৃশ্য থেকে ক্রমাগত আরো আরো প্রচ্ছায়াদের মুখের ভাঁজে মাখতে থাকে। মাখতেই থাকে। আর কাকটা বিব্রতভাবে আরো আরো মাথানিচু করে।

ছেলেটির দিকে চেয়েই থাকে সঙ্গীটি। ছেলেটি টের পায়। যেভাবে টের পাচ্ছে কাকটা। কিংবা, হয়তো, যেভাবে টের পেয়েছিল মাথা-না-দেখানো গার্মেন্টস-হাতখানা। ছেলেটির মুখে প্রচ্ছায়ারা আরো ঘনীভূত হলে, নিছক বাৎসল্যে, সঙ্গীটি তার কাঁধে আলতো খুউব আলতো একগোছা হাত রাখে। আর ছেলেটি জানালার শার্সি থেকে, অকস্মাৎ, ডুকরে কেঁদে ওঠে। সঙ্গীটি দুই হাতে মুখ ফেরানোর চেষ্টা করে ওর। শার্সিটা খোলা ছিল বলে কিছুতেই বোঝা যায় না প্রচ্ছায়ার অধিকন্তু ওর মুখে জলগুলো কীসের। বৃষ্টিরও হতে পারে। কিংবা কান্নার। কিংবা দুয়েরই। কিন্তু এখন তো সে ডুকরে কাঁদছে।

সঙ্গীর নিমন্ত্রণে সে সমর্পিত ভারে মুখ ফেরায়। সঙ্গীকে গাঢ়, শক্ত, ব্যাকুল আলিঙ্গান করে। তারপর তার কাঁধে নিজের মাথার ভার গুঁজে দিয়ে সে কাঁদতে থাকে। দুজনে এরপর নিতান্ত নিরুপায়, অথচ আকাঙ্ক্ষিত, স্পর্শে ভরিয়ে দিতে থাকে দুজনকে। আর ঠিক তখনি কাকটা একবার আলগোছে খোলা শার্সিটার দিকে চায়। এবেলা চোখ নামিয়ে সে আবার বৃষ্টি থামবার প্রার্থনায় মনোযোগ দেয়।

(২৮শে জুন, ২০০৪/শ্যামলী)

উদ্‌যাপন

"তুমি বলছ তুমি উদ্‌যাপন কর?"
আমার পাশের মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞেস করল আবার।
"হ্যাঁ আমি করি।"

আমাদের চারপাশে নৈঃশব্দ। নৈঃশব্দের তীক্ষ্ণতাটা আমি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু ও এবারে টিকে গেল।

- কিন্তু কেন?
- কারণ এটাই আমার একমাত্র উপায় কিংবা ধর এটাই একমাত্র শব্দ যা দিয়ে আমি ধরতে পারি।
- কী ধরতে পার?
- আমার অনুভূতি...

আমরা দুজনেই ব্যথায় বুঁদ হয়ে বসে রইলাম। ও আমার চোখের দিকে চাইল, আমার থুতনির দিকে। আমার কাছ থেকে ভিন্ন একটা উত্তর ও আশা করছিল এবং সে কারণেই ব্যথাতুর। আর আমি ওর আশা করাটা নিয়ে ভাবছিলাম আর বিষণ্ন বোধ করছিলাম। পালকের মতো তুষারের পাপড়িগুলো তখনো দোকানের জানালার কাঁচে লেগে আর আমাদের এই জাদুকরী মোলাকাতটাকে ঘোষণা দিচ্ছে। আমার নাঞ্জা স্বীকারোক্তিতে ধাক্কা পাওয়া ছাড়া ওর কোনো উপায় ছিল না, আমি জানি। কিন্তু আমিও আর অন্য কিছু করতে পারতাম না। সান্নিধ্যের দৈরথগুলো আমি উপভোগ করি – আমার সব থেকে স্পষ্ট উত্তর, সবসময়েই যা ছিল। ওকে স্পর্শ করবার কথা আমি ভাবলাম কিন্তু করলাম না। নৈঃশব্দের মধ্যে আমরা হাঁটতে থাকি। আমি ভীষণ চাইছিলাম ও আমার সাথে বাসায় চলুক। কিন্তু আমি বললাম না। আমার দিকে তাকাল ও, এখনো জিজ্ঞাসু আর দারুণ প্রসন্ন কিন্তু আহত। আমি ওর দিকে চাইলাম, এখনো সুনিশ্চিত আর কামাতুর কিন্তু বিষণ্ন। বাসার দিকে আমরা চলতে থাকলাম আর আমাদের পদক্ষেপগুলো একটার পর আরেকটা একজন আরেকজনকে বাসার দিকে নিয়ে যেতে থাকল। বাসায় একত্রে পৌঁছালাম আমরা।

পরের একটা দিনের আগ পর্যন্ত পরস্পরকে আমরা স্পর্শ করিনি। তবে আমরা দু'জনেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা রৈখিক, অবধারিত পথে আসছে। স্পর্শরাজ্যের জন্য আমরা কাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছিলাম এবং সেটা এল...

"তো, কলিজা আমার, তুমি উদ্‌যাপন করছ না?" মদির আলস্যে আর চপল গলায় আমি জিজ্ঞাসা করি।

"আমি করছি তো! আমি জানি আমি করছি তো!" নির্মিলিত চোখে আর লাস্যে সে বলে।

"তাহলে ভাবনাটা কীসের?" সুখশ্লেষায় আমি বলি।

আমাদের মধ্যে খসড়া একটা ফয়সালার এটাই শুরু ছিল। আমরা ভাসতে থাকি...

আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা সমেত আমরা চলতে থাকি, সম্ভাব্য যত দ্বৈরথ সম্ভব আমরা আয়োজন করতে থাকি। আমরা অপেক্ষা করতে থাকি, অনুভূতি-উন্মাদনায়। দু'জন দু'জনকে প্রশ্বাস নিতে থাকি আমরা বাতাসের মতো, দু'জনে ভাসতে থাকি চাঁদের মতো, অবগাহন করতে থাকি সমুদ্রের মতো। কেবল আমার লালসা নিয়ে কথা বলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আসলে ও বন্ধ করেছিল। আমরা চলতে থাকি ... পরের বসন্তের আগ পর্যন্ত।

বসন্তে ওর ফিরে যেতে হলো। ফলে আমরা যত পারা যায় সান্নিধ্যেই থাকলাম – ক্যাফেতে, ঘাসের জমিনে, আকাশের নিচে আর অবশ্যই দু'জনের বাসায়, দু'জনেই আমরা সন্নিকট বিচ্ছেদের ভয়ে চুপসে। ও আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি ওর দিকে চেয়ে থাকি। ও ভাবছিল আমি আমার বক্তব্য বদলাব। আমি চাইছিলাম ও না যাক কিন্তু সে কথাও বলা হলো না। এবং ও চলে গেল।

একটা চাঁদনি রাতে, আমি ওর কথা ভাবছিলাম কিংবা ভাবছিলাম চাঁদটার কথা। আমি নিশ্চিত না কী ভাবছিলাম আমি। ফোনটা তখনই বেজে উঠল।

- কেমন আছ?
- ভালই তো মনে হচ্ছে।
- তুমি এখনো তোমার দ্বৈরথ উদ্‌যাপন কর?
- হ্যাঁ করি।
- আচ্ছা, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ তোমার সঙ্গে আছে। আমি বরং ফোন রেখে দিই তাহলে।
- ঘটনাচক্রে আমি এখন একা। তোমার গলা শুনতে পেয়ে মনে হচ্ছে বেঁচে আছি।
- আমার জন্য মন পোড়ে তোমার?
- খুব পোড়ে...
- কীভাবে বুঝতে পার?
- কীজানি আমার মনে হয়...
- কখন?
- বিশেষতঃ যখন আমি কাঁদি...
- তুমি আমার জন্য *কাঁদ*?

ওকে খুব অবাক শোনাল।

- হয়তো তোমার জন্য, কিংবা এমনকি আমার নিজের জন্য ... আমি ঠিক নিশ্চিত না।
- আমাকে কখনোই কিন্তু তুমি এটা বলনি।

ওর গলা আর্দ্র আর ভীষণ বাৎসল্যে ভরা...

- হ্যাঁ বলিনি ... আসলে তখন এটা প্রাসঙ্গিক কিছু মনে হয়নি।
- তুমি না ভীষণ জটিল...
- হয়তো ... অথবা কীজানি হয়তো একদম উল্টো...

ছোট্ট একটা বিরতি। খুব ছোট, কিন্তু একটা দুরপাল্লার ফোনের জন্য অনেক। তারপর ও বহুদিনের জমিয়ে রাখা প্রশ্নটাই আবার করল...

- কীভাবে তুমি তাইলে বল যে তুমি তোমার লালসা উপভোগ কর?
- কারণ জানু এটা এভাবেই ঘটে। এমনকি আমার দ্বৈরথগুলোও কান্না থেকে আমাকে নিষ্ক্রান্তি দেয় না ... ফলে আমি কাঁদিও!

নৈঃশব্দ ... আবারও নৈঃশব্দ।

(রচনা ২৩ ও ২৪ এপ্রিল ২০০৫, বাংলাকরণ ০৪ জানুয়ারি ২০০৭)

স্টারট্রেক

জাকের ভাই বাকের ভাইয়ের ভাই নন। এমনকি এর যে তেমন কোনো সুযোগ তাঁর হাতে ছিল তাও নয়। কিংবা সুযোগ ছিল না বাকের ভাইয়েরও। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় স্বতন্ত্রভাবে জন্মে তাঁরা সেই সম্ভাবনা বহু আগেই নষ্ট করেছেন। সে অনেক কাল আগের কথা। আর অন্য সময়ে যাই ভাবুন না কেন, এখন ক্রিকেটের ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের এই কেলেঙ্কারির যুগে, ফিক্সড-ভাই (পাতানো ভাই) ব্যবস্থাটাও তাঁদের পছন্দ হবার কথা নয়। তা অবশ্য তাঁরা ভ্রাতৃযুগল হলে এমন কিছু ভাল হতো, পরিস্থিতি বিবেচনায়, তা বিশেষ বলাও যায় না। সোদর না হওয়াটা যেমন তাঁদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ছিল, দোসর হবার ইচ্ছাসাপেক্ষ কাজটা তাঁরা করেছেন কারো দ্বারা প্ররোচিত না হইয়াই।

কিন্তু ঝামেলাটা এখানেই। তাঁরা যে কারো দ্বারা প্ররোচিত হন নাই, তা সংশয়াতীত ভাবে মেনে নেবার মত লোক দিনকে দিন কমে আসছে শহরে। বারংবার ঘুরে ফিরে তাঁদের বদনাম করে বেড়াচ্ছে কিছু লোক। বদনামটা বেশ কিন্তু জটিল প্রকৃতির। এখানে, অন্তত আলাপটা চালিয়ে নেয়ার স্বার্থে, লিভার ভ্রাতৃবৃন্দের নাম মুখে আনতেই হয়। লোকজনের কুৎসা রটানোর একটা অন্যতম ইস্যু হলো এই ভ্রাতৃবৃন্দের ক্রিয়াকাÉ। লোকজনের বক্তব্য: জাকের ভাই ও বাকের ভাইয়ের দোসরতা আসলে সোদরতারই নামান্তর। এবং উদরটা হলো গে লিভার।
তাজ্জব কথা!
উদরে লিভার থাকে বটে, তাই বলে গোটা উদরটাই লিভার? আর যেখান থেকে এই দোসরেরা পয়দা হয়েছে!
এই রকম একটা আজগুবি বিষয় কানে আসার পর আপনার পক্ষে কি আর সম্ভব 'তেমন কিছু নয়' বলে বাসায় বসে থাকা!

যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানেই নানাবিধ খবর বেরোতে লাগল। মেলারকম গল্প। একটা হলো: জাকের ভাইয়ের যকৃতে, মানে লিভারে, গোলমাল ধরা পড়বার পর তিনি এদিক-সেদিক ঝাড়ফুঁক করতে যান। কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তখন কেউ একজন তাকে – কে যে সেটা ভাল বোঝা যায় না, বেশ ঝাপসা এই জায়গাটা – লিভার ভ্রাতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হতে বলেন। তিনিও যান। সেখানে গিয়েই তিনি পেয়ে যান বাকের ভাইকে। তিনি সেথায় হানা দিয়েছিলেন এই ভীতির কারণে যে তাঁরও কখনো যকৃত গোলমাল বাধিয়ে বসতে পারে। ব্যস! যেই না তাঁরা পরস্পরকে দেখেছেন প্রথমেই প্রায় তেড়ে-বেড়ে একে অন্যের দিকে ধেয়ে গেলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন। কুশল জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না যদিও, তথাপি লিভার ভ্রাতৃবৃন্দের বিলাতিপনায় সেটাও করলেন। তারপর যখন তাঁরা পরস্পরের আগমন-হেতু জানতে পারলেন, অমনি, বাৎসল্যে, ভীষণ বেগে কোলাকুলি করতে শুরু করে দিয়েছেন। এরপর সেটা আর থামাননি।

দ্বিতীয় গল্পটা একেবারে ইয়ে গোছের আর কী! সেটা হলো: বাকের ভাই, কোনো এক রহস্যজনক কারণে, ঘন ঘন টয়লেটে যান, মানে যেতেন। তো সেই নিরন্তর গতায়াত – প্রায় যাকে অভিযাত্রাই বলা যায় – তাঁকে এক অনির্বচনীয় বিমূর্ত পুলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এবং সেই সূত্রেই তিনি যাবতীয় ইয়ে মানে টয়লেটের প্রতি, মানে হলো গে টয়লেট্রিজের প্রতি কেমন যেন ঘোরলাগা আচরণ করেন। কাউকে নতুন দেখলেই এসবের নান্দনিকতা বোঝাতে বসেন। যখন, কোনো এক অছিলায়, জাকের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েই যায় তখন তিনি তাঁকেও এ বিষয়ে বলতে শুরু করেন। জাকের ভাই, পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাতেই হোক, কিংবা আরো গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটনের নিমিত্তেই হোক, লিভার ভ্রাতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাকের ভাই সমেতই। তো তারপর চলতে থাকে।

আসল গল্পটা শুরু হয় কিন্তু তারপর থেকে।

এদিকে লিভার ভ্রাতৃবৃন্দকে নেহায়েত নাদান ভাবলে পাঠকেরা ভুল করবেন। বৃন্দগিরি তাঁরা বহুকাল ধরেই ভাল চিনতেন। নিজদিগের কৃতিত্বের ব্যাপারে তাঁরা সম্যক আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তথাপি এই জাকের ভাই-বাকের ভাই যুগলের এলেমের সঙ্গে সঠিকভাবে মানানসই কী ক্রিয়াদি তাঁদের কাছে অর্পণ করা যায় সে ব্যাপারে তাঁরা নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না। এরকম চলতে চলতে একদা রাত্রিকালে যখন ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে বাংলাদেশ বিমানের একখানা বাহন হোটেল সোনারগাঁয়ের

ওপর দিয়ে এয়ারপোর্ট অভিমুখে ভূমাইতে যায় তখন 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে লিভার ভ্রাতৃবৃন্দ চিৎকার করে ওঠেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা তাঁদের স্মরণ হয় এবং নক্ষত্র অভিযানের দারুণ রোমাঞ্চকর দায়িত্ব জাকের-বাকের ভাইদের হাতে ন্যস্ত করা হবে বলে সাব্যস্ত করেন তাঁরা।

এরপরের ইতিহাস খুবই সামান্য। আলোকিত রঙ্গমঞ্চে বঙ্গাল মুল্লুকের প্রথম নক্ষত্র-অভিযানের সাফল্য বর্ণনা করবার জন্য সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। ভীষণ সব আলো-টালোর ব্যবস্থা হয়েছে। এসবের ব্যবস্থা, বলাই বাহুল্য, লিভার ভ্রাতৃবৃন্দই করেছে। আর কত লোক!

ফুলহাতা পাঞ্জাবি পরে এসেছেন দেশের শ্রেষ্ঠ সব পুরুষ সন্তানেরা। বিশেষ করে যাঁদের ইতিহাস বোধ প্রবল, তাঁরা কিছুতেই পাঞ্জাবি-ছাড়া আসেননি, এমনকি পাজামাও তাঁরা ভুলে ফেলে আসেননি। সাফারি পরে এসেছেন সিভিল (অবঃ) মিলিটারিরা। ডেনিম জিনস পরে এসেছেন তরুণ কবিরা। যা-কিছু একটা পরে এসেছেন শ্রেষ্ঠ পত্রিকার সব সাংবাদিকেরা। আর শ্রেষ্ঠ কবি এসেছেন তাঁর নতুন লেখা কবিতাটা হাতে করে। টাঙ্গাইল শাড়ি পরে এসেছেন শ্রেষ্ঠ নারী সন্তানেরা। আর আলিফ-লায়লা সিরিয়ালের মত সব জামা-কাপড় পরে এসেছেন নক্ষত্রগামী নারী-পুরুষেরা। সকলেই কাপড় পরে এসেছেন। আর যাঁরা সেই আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে যেতে পারেননি তাঁরা, নিছক ঈর্ষাসমেত, পরের দিন পত্রিকায় দেখে নেবেন বলে আগাম টাকা হাতে করে হকারদের খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

সকলেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। কথা বলছেন। আর বঙ্গাল মুল্লুকের এহেন সাফল্যে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। মঞ্চের টেবিলের সঙ্গে লিভারখানা, মানে ভুঁড়িখানা ঠেকিয়ে দিয়ে আপন মনেই হেসে চলেছেন জাকের ভাই। আর মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে আছেন বাকের ভাই। তিনি মনে মনে তাঁর কণ্ঠখানা ঝালিয়ে নিচ্ছেন। 'আজগের ... (ঘোঁত ঘোঁত ... বিরতি ... কোঁৎ, আসলে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে এই অংশটি লিপিমালায় ভালমত অনুবাদ করা দুরূহ) মহতী অনুষ্ঠানের ...।' অনুষ্ঠানে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট পিস কী হবে সবাই সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করছেন। এমন সময়ে সকলের হাতে শ্রেষ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক রচিত প্রবন্ধখানা বহুমুদ্রিত হয়ে এসে গেল: "নক্ষত্রাভিযানের প্রেক্ষাপটে বঙ্গাল মুল্লুকের নারীমুক্তি"। উপস্থিত সুধীবৃন্দ বুঝে গেল আর কোনো ব্রিলিয়ান্ট পিস আসার চান্সই নেই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবি তখন অলখে হেসে চলেছেন। আর যকৃত বাগিয়ে জাকের ভাই তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। এরপর বাকের ভাই মাইক্রোফোনে বললেন: "আমাদের কোবি (পূর্ববৎ কণ্ঠনিসৃত আওয়াজ ও বিরতি) আজ সাবান (তথৈবচ) বিষয়ে (আবারো পূর্ববৎ ...) কোবিতা (প্রাগুক্ত) রচনা করে (প্রাগুক্ত) এনেছেন। আমি (প্রাগুক্ত) সেটিই এখন (প্রাগুক্ত) আআবৃত্তি কোরবো।"

সবাই তাজ্জব বনে গেল। 'সাবান বিষয়ে!'
এ ওর কানে মুখ নিয়ে বলে গেল 'আমাদের কবির আবার গোসল খুবই পছন্দ।'

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কবিতাটা শুনবার পর সবাই মানতে বাধ্য হয়ে গেল কিন্তু যে নক্ষত্রাভিযানে সাবানটাই আসল। বিজ্ঞানীরা কিছুক্ষণের জন্য গাল ফুলিয়ে বসে থাকলেন বটে। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য। অতঃপর সকলেই হাততালি দিতে দিতে এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসিতে গড়িয়ে যেতে থাকলেন।

সেই থেকে....

সেই থেকে সবচেয়ে কস্ট-ইফেক্টিভ নক্ষত্রাভিযান বঙ্গাল মুল্লুকেই হচ্ছে।

শ্যামলী/১৮ই জুন ২০০৪

সভ্যতার সূচনা

এখন প্রত্যেকেই, স্বর্গের কিংবা মর্ত্যের, বাংলাদেশ সম্পর্কে জানেন। জানেন যে এটা সীমাহীন দুর্যোগের একটা দেশ। বা বলা চলে তাঁরা আফ্রিকান কিংবা এশীয় অন্য অনেক দেশ নিয়েই জানেন। এই তথ্যে প্রজ্ঞার দেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর পুরনো সভ্যতার মানচিত্রটা খুঁজতে লাগলেন। এটা প্রায় জীর্ণ হয়ে গেছে। কোনো আগামাথা না-বুঝে তিনি ভাবলেন অন্যদের সঙ্গে আলাপ করবেন। লাউঞ্জে যাবার পথে, দেখা হলো যুদ্ধদেবের সঙ্গে। প্রজ্ঞাদেবীর বিশেষ আগ্রহ নেই ওর সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু যুদ্ধদেবই শুরু করলেন:

'দেখতে পাচ্ছি আপনি অচল ম্যাপটা সাথে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'কিন্তু এটাই তো সভ্যতার মানচিত্র।' প্রজ্ঞাদেবী বললেন।

'ঠিক আছে, আমি জানি যে কিছু লোকে এখনো তাই মনে করে বটে। নতুন ম্যাপটার একটা কপি আপনার থাকা উচিৎ।'

'কিন্তু আপনারা যেভাবে রাজ্যটাজ্য ভাগ করেছেন আমি তো বিশেষ বুঝতে পারি না।'

'হা হা হা! সাবেকী দেবতাদের এই সমস্যাটাও হচ্ছে বটে।'

'এটা আপনার ভীষণ অভদ্রতা হচ্ছে কিন্তু।'

'কিন্তু এটা সত্য। সভ্যতার সূচনা হয় কেবল তখন যখন শ্বেতাঙ্গরা এটার সংজ্ঞা দিতে শুরু করল। এগুলো আপনার পরিষ্কার বুঝতে পারা উচিৎ।'

'মানে যখন তারা সব জায়গায় রক্তপাত শুরু করল।'

'আপনার এরকমটা মনে হয়। কিন্তু এটা সত্য না।'

'সত্যের নিশ্চয়ই যৌক্তিকতা থাকতে হয়, রীজন।' তাঁকে বেশ ক্রুদ্ধ শোনায়।

'এটা আরেকটা ভার্সন, অবশ্যই পুরনো ভার্সন। সত্য কেবল রিপ্রেজেন্টেশনের কাছে দায়বদ্ধ আসলে।' যুদ্ধদেব নিশ্চিত করলেন।

'আপনি জানেন যে প্রজ্ঞার দেবতা আমি।' দেবীকে এখনো ক্রুদ্ধ শোনায়, কিন্তু খানিক বিচলিতও।

'আমি জানি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আপনি লক্ষ্য করছেন না যে ইদানীং আরেকটা পোস্ট আছে যার নাম শব্দাবলির দেবতা। জানেন আপনি?' যুদ্ধদেব বেশ চাপ দিয়ে তাঁর কথাগুলো বললেন।

'আমি বুঝতে পারছি যে কোনো না কোনোভাবে এটার বোধহয় দরকার পড়েছিল। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে আমার ভূমিকা বাতিল হয়ে যায়।' তাঁকে ভালমতো অনিশ্চিত শোনায়।

'আসলে তাই যায়। যেকোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে শব্দই মূল। প্রজ্ঞার কাজ না এটা আর। আর এই ডিপার্টমেন্টটাও খুব ভাল কাজ করছে। সত্যিকার অর্থে আমাদের খুব ভাল টীমওয়ার্ক যাচ্ছে এখন।'

'আচ্ছা তাই বুঝি? তাহলে তো আর কোনো আশা নেই।' তখনো তিনি অনেক নিশ্চিত নন যে এসবের মানে আসলে কী।

'আপনার চাকরি কিংবা বেতন সবই তো অটুট আছে। আপনার তো আসলে খুশিই হওয়া উচিৎ।'

'হ্যাঁ আমি খুশিই আছি।'

তাঁকে দেখাচ্ছিলও খুশি। তিনি ভাবলেন গিয়ে পড়ালেখা করে আরও একটু কিছু বোঝাপড়া করতে হবে। কিছুদুর গিয়ে তাঁর জরুরি ভাবনাগুলোর কথা মনে পড়ল এবং যুদ্ধদেবের কাছে আবার ফিরে এলেন।

'কিন্তু আপনি কি প্লিজ বলতে পারেন যে কেন এসব জায়গাকে দুর্যোগেময় এলাকা বলা হচ্ছে?'

'বলা হচ্ছে কারণ এগুলো দুর্যোগে ভরা – ক্ষুধা, দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আরও মেলাকিছু।'

'কিন্তু সেটা কীভাবে হয়, তাছাড়া আপনারা তো সভ্যতা অন্যভাবে সংজ্ঞা দিচ্ছেন?'

'হা হা হা! আমি বুঝতে পারছি না আপনার বিস্মরণের অসুখও হলো নাকি। একসময়ে আপনি আমাকে বলেছিলেন যে জ্ঞান একটা বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া। এবং এর নিজস্ব মূল্য চুকানোর ব্যাপার আছে। বলেননি? এখন এরা সভ্যতার পাঠ নিচ্ছে, গত ৪০০ বছর ধরে এরা সভ্য হচ্ছে। এখন এদের মূল্য চুকানোর পালা। আপনি এটাকে স্পোর্টিংলি নেন না কেন!'

*

আসল ব্যাপারটা বুঝে ফেলে, প্রজ্ঞার দেবী নতুন সভ্য বিশ্বের আনাচে কানাচে একটা চিঠি পাঠালেন। ‘একে স্পোর্টিংলি নাও।’ এই প্রথমবারের মতো তিনি শব্দাবলির দেবতার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করলেন। এমনকি, কোনো কোনো অসমর্থিত সূত্রমতে, এই ভাষ্যটা তৈরিও হয়েছিল শব্দদেবতার দপ্তর থেকে।

নবসভ্য বিশ্বের প্রতিটি বাসিন্দা এই প্রজ্ঞাপন পাঠ করল।

ঠিক তখন থেকে, আমরা সকলে, বাংলাদেশীরাও সমেত, দুর্যোগকে ক্রীড়াচ্ছলে নিয়ে থাকি – তা সে বন্যা পরিকল্পনা হোক, মানে কিনা বন্যা হোক, কিংবা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসম বাণিজ্য, খনিজ পদার্থ, বোমা, বিদেশী সৈন্য – যার নাম বলেন। আমরা ক্রীড়াচ্ছলে নিয়ে থাকি, আসলেই।

(রচনা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বাংলাকরণ ০৪ জানুয়ারি ২০০৭)

অচ্ছুৎপুরাণ: মানুষ ভ্রমণ করা শিখিল কিরূপে

এই কিস্‌সা কোন এক কালের। এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। রাজা যথার্থই ছিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া তিনি নাভিমূলে দুই ছটাক এবং তাঁহার কর্ণযুগল পর্যন্ত প্রসারিত মোঁচরাজিতে আরও দুই ছটাক তৈল মর্দন করিতেন। রাজার এহেন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য জ্ঞানে চারিদিকে, বিশেষত পারিষদদিগের কণ্ঠে, ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। রাজা তাহাতে পরম পুলক বোধ করিতেন, আর তাহা সঙ্গতই মনোনিবিষ্ট আছিলেন। ফলে তাঁহার নিষ্ঠা লইয়া চারিদিকের পারিষদগণ দীর্ঘকায় মানপত্র লিখিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। রাজাও পরম তৃপ্তিতে তাঁহার পক্ষীপালক দ্বারা নির্মিত তাকিয়ায় অর্ধশয়নে চক্ষু মুদিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। চক্ষু মোদন করিবার কিছু বস্তুগত কারণ রহিয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্রের সম্মুখে মোঁচযুগলে প্রযুক্ত সরিষা তৈলের প্রাকৃত সুবাস সারা দিনমান তাঁহাকে আমোদ দিত। কিছুটা নিদ্রালু থাকিতেন তিনি। এইভাবে ভালমতই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু শেষে গোল বাধিল ঐ সরিষার তৈল লইয়াই।

সরিষা তৈলের সম্পূর্ণ হিসাবটা সহজ কিছু নহে। উল্লেখ করা উপযোগের অধিকন্তু আরও কিছু প্রয়োজন তৈলের ছিল। শয়ন প্রাক্কালে রাজা দাসদিগের সাহায্যে তাঁহার দীঘল কৃষ্ণ কেশরাজিতে ছয় ছটাক তৈল প্রয়োগ এবং প্রগাঢ় নিদ্রার বাসনায় নাসারন্ধ্র পথে আরও দুই ছটাক তৈল নিক্ষেপ করাইতেন। এইরূপে দৈনিক সর্বমোট বারো ছটাক তৈলের নিশ্চিত প্রয়োগ ঘটিত রাজার শরীরে। ফলে মাসে সাড়ে বাইশ সের ও বছরে মোটামুটি পৌণে সাত মণ খাঁটি তৈলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইত। কিন্তু এইখানে সীমাবদ্ধ থাকিলে তো আর কথা ছিল না! রাজার তৈল সংযোগ অচিরেই একটা অনির্বচনীয় নান্দনিক অভ্যাস হিসাবে বিবেচিত হইল এবং তাহা পারিষদদিগকে এই ফ্যাশনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ফেলিল। আর রাজা যেহেতু রাজপাটের সমৃদ্ধিতে উৎসাহী ছিলেন, রাজণ্যবর্গের কলেবর ক্রমে যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে কম কিছু বলা যাইবে না। কিছুকালের মধ্যেই পারিষদদিগের নাসারন্ধ্রের সম্মুখভাগে মোঁচ গজাইয়া তাঁহাদের কর্ণযুগলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল, তাঁহাদের নাভিমূল প্রত্যহ সকালে তৈল কামনায়

উন্মোচিত হইতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রিকালে তাঁহাদের নানা মাপের নাসারন্ধ্র দাসদিগের সম্মুখে সমর্পিত হইল। এলাহি ব্যাপার। আর তাহা সম্পাদিত হইতে মট্‌কা মট্‌কা তৈলের প্রয়োজন দেখা দিল। একমাত্র কেশবিহীন কতিপয় পারিষদের কিছু কম তৈলে কাজ চলিত – এই যা। উপরন্তু ফ্যাশন হিসাবে ইহা বিস্তার লাভ করিবার পর রাজমর্যাদা বজায় রাখিতে রাজার শরীরে দুই ছটাক অতিরিক্ত তৈল প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাজা বিচক্ষণ ছিলেন। এই বিপুল তৈল উৎপাদনকে একটা সিস্টেমের মধ্যে আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি শুরুতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'এইবার তৈল উৎপাদন প্রাসাদের প্রাঙ্গণেই সাধিত হইবে।' কিন্তু ইহা একটা বৃহৎ এন্তেজাম। অতঃপর প্রাসাদের চতুর্পার্শ্বে সরিষা তৈলের ইন্ডাস্ট্রি গড়িবার উদ্যোগ সম্পন্ন হইল। এই সময়কালে আরও একটি সমস্যায় রাজাকে পড়িতে হইল। সকলেই অবগত ছিলেন রাজ্যের ছাগলকুল সরিষা রাইয়ের প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের দুর্বল। অচিরেই সংবাদ আসিতে লাগিল যে বিভিন্ন অঞ্চলের সরিষাকাতর ছাগলকুল প্রবল ব্যগ্রতায় সরিষা ক্ষেত্রের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। আসলে ছাগলকুল ছাগল ছিল বলিয়া রাজা ও রাজণ্যবর্গের ফ্যাশন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। ফলে বাধ্য হইয়া রাজার ঘোষণা করিতে হইল, 'এখন হইতে রাজ্যের সকল ছাগলকে প্রাসাদপ্রাঙ্গণে ছাগলখানায় থাকিতে হইবে।' ছাগলখানা নির্মাণ হইল। সমস্ত রাজ্য চষিয়া কর্মচারীরা ছাগল সংগ্রহ করিয়া আনিল প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। প্রাসাদ প্রাঙ্গালে ছাগলকুলের পক্ষে সমস্বরে ডাকাডাকি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিবার ছিল না। বড় নিষ্কর্মা হইয়া উঠিল তাহাদের জীবন। কারণ, সরিষা তৈল উৎপাদনের ঘানিগুলা টানিবার জন্য তাহারা যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না। তাহাদের পক্ষে যন্ত্রটি কিছু ভারীই বটে। বরং রাজার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইল যাহাতে প্রচুর সংখ্যক গরু এই দায়িত্ব পালন করিতে পারে। নিরীহ ষঁদলের নিবাসও প্রাসাদ প্রাঙ্গণ নির্ধারিত হইল।

এই মত সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবার পর রাজা ও পারিষদদিগের চিত্তে বিপুল আনন্দ সঞ্চালিত হইবারই কথা ছিল যদি না এক্ষণে রাজার মানপত্র শ্রবণ কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইত। সত্যকার অর্থেই কার্যক্রমটিতে চরম ব্যাঘাত ঘটিল। তৈল উৎপাদনের বিশাল ইন্ডাস্ট্রিতে তৈল উৎপাদনের কার্য ছাড়াও নিদারুণ শব্দ উৎপাদিত হইতে লাগিল। উৎপাদিত তৈল তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত, উৎপাদিত শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সক্ষম ছিল। ইহার সঙ্গে যোগ হইয়াছিল নিষ্কর্মা ছাগলদিগের ব্যা-করণ ধ্বণি। মহা গোলমাল। রাজা ও কর্মতৎপর পারিষদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার যোগাড় হইল। তাঁহাদের কর্ণযুগল ঠসা হইবার উপক্রম হইল। তাঁহাদের নৈমিত্তিক কার্যসূচিতে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দিল। প্রত্যহ মানপত্র পাঠ এবং গীতবাদ্য শ্রবণ করিতে না পারিয়া রাজার, তৎসঙ্গে মানপত্র পাঠ করিতে না পারার বেদনায় পারিষদদিগের চেহারা হইয়া গেল মলিন। রাজকার্য কার্যত অচল হইয়া গেল।

অকস্মাৎ এক প্রভাতে মোঁচে তৈল মর্দন কালে রাজা হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, 'এইভাবে আর চলিতে পারে না। এক্ষণ হইতে মাসান্তরে একবার রাজকর্ণের নিমিত্তে মানপত্র পাঠ এবং গীতবাদ্যের আয়োজন হইবে এবং ..., এবং তাহা অনুষ্ঠিত হইবে রাজপ্রাসাদ হইতে দুরে। রাজপারিষদদিগের সকলেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইবে। সকলে হাঁপ ছাড়িল নিষ্ঠুর জীবন হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনায়। এইরূপ আদেশ হইবার পর হইতে মাসান্তরে রাজা, পরিষদ ও রাজ কর্মচারী সকলে মিলিয়া হাতিশালের হাতি চড়িয়া, ঘোড়াশালের ঘোড়া চড়িয়া – এমনকি ঘানিটানা গরু চড়িয়া প্রাসাদ হইতে দুরে যাত্রা করিতেন। এইভাবে ভ্রমণ করা শিখিল মানুষ। বোঝাই যাইতেছে এই ভ্রমণ হইতে বাদ পড়িয়াছিল কেবল নির্বোধ ছাগলকুল।

পুনশ্চ: যতদুর জানা যায় এই প্রকার বিচক্ষণ ব্যবস্থাও কেহ কেহ সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রাথমিকভাবে এই কাতারে সম্পৃক্ত হইলেন রাজা প্রাসাদের দাসবর্গ এবং ছাগলকুলের প্রপালকবর্গ। অচিরেই প্রাসাদের সকল নারীরা এই শিবিরে সমবেত হইলেন। তাঁহারা রাজা ও পারিষদের এই প্রকার মোঁচদৃপ্ত তৈলময় জীবনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। এইরূপও শ্রুত হয় যে, তাঁহারা একযোগে রাজা ও পারিষদদিগকে চিরকালীন ছুটি দিয়া দিবার উদযোগ লইয়াছিলেন। এই লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তে তাঁহাদের পক্ষে কিছু

কার্যক্রমও লইতে হইয়াছে। রাজ্যব্যাপী বাসিন্দাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইয়াছে। এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে এই প্রকার নড়াচড়াকে তাঁহারা ভ্রমণ না বলিয়া মিত্র অন্বেষণ বলিতেন।

(ঢাকা, ০৭ আগস্ট ২০০০)

হাইপোথেটিক্যাল 'তালিবান'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি উড়বে। আর **আপনি**, একটা জানালার ধারে বসে, ওপারে তাকিয়ে আছেন – যদিও নির্দিষ্টতা নেই সেই চাহনিতে। আপনি রানওয়ে দেখছেন, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের আরেকটারই মতো। তারপরও এর বুকে কিছু ফাটল আপনি আবিষ্কার করতে পারলেন। এগুলো ঠিক আপনি আশা করেন না যখন বিমানে চড়েন প্যারিস থেকে, অথবা ধরুন পার্থ কিংবা পেনসিলভানিয়া থেকে। অন্ততঃ এই ফাটলগুলো থেকে একটা সূত্র পাওয়া যায় যে আপনি এখন পেশওয়ারে আছেন। তথাপি ওই ফাটলগুলো আপনার চোখে বিশেষ কোনো স্পষ্টতা দেয় না, সেগুলোতে আপনাকে বিশেষ উদ্যমী মনে হয় না। এটা কেন হচ্ছে যে যে-ফাটলগুলো পেশওয়ারের রানওয়েকে অনন্য করেছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনি উৎসাহী হয়ে উঠতে পারছেন না?

আপনি ভাবছেন কাবুলে রকমারি মানুষের ভিড়ের কথা। অধিকাংশই তাঁরা প্রাত্যহিক কাজকর্মে ছুটছেন। কিন্তু আপনি বিশিষ্টজনদের ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল। যাঁরা আফগানদের জন্য ভাল একটা কিছু করার জন্য জান দিয়ে দিচ্ছে। আপনি তাঁদের চেনেন। তাঁদের উন্নয়নমনস্কতাটাকে আপনি খুব ভাল চেনেন। এবং আপনি নিজেও এভাবে বা সেভাবে এদেরই একজন হতে যাচ্ছেন। তবুও এসব আপনাকে আগ্রহী করছে না। আপনি কাবুলের এই রকমারি ভিড়ের জন্য উৎসুক নন, কিংবা তামাম আফগানিস্তানের। আপনি জানেন একটা মুখচ্ছবি যে মানুষটার হবার কথা তাঁকে আপনি সেখানে পাচ্ছেন না। হবার কথা – কারণ কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না একটা বিশেষ মুখচ্ছবি একটা বিশেষ মানুষেরই থাকে কিনা। সোজাভাবে বললে, আপনি কি নিশ্চিত হতে পারেন যে আমেরিকায় কেবল একজন মাত্র বুশ আছেন, কিংবা তামাম বিশ্বে? কিংবা, আপনি কি নিশ্চিত হতে পারেন যে একজন লোক রয়েছেন যাঁর নাম বুশ এবং তাঁর এমন একটা মুখাবয়ব রয়েছে যেটাকে প্রতিদিন মিডিয়াতে বুশ বলে দেখিয়ে থাকে? আর এখন এরকম কোনো দৈনিক-দেখা মুখের কথাও আমরা বলছি না। ফলে, হাইপোথেটিক্যালি, যে ছবিটা আপনি দেখেছেন তার কথিত মালিক সর্বদাই একজন বড়জোর সম্ভাব্য হয়ে ছিলেন – রাহমাতুল্লাহ হাশেমী। এবং তিনি

সেখানে কিছুতেই নেই – কারণ কাবুলের কেউই তাঁকে খুঁজে পাবার একটা ভাল রাস্তা দেখাতে পারবে না। কিংবা, দুনিয়ার কেউই খুব ভাল রাস্তা খুঁজে পাবে না। যদি কোনো একটা কিছুর তাল করবার জন্য কাউকেই কোনোরকম ক্লু দেবার জন্য না পান কী সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ আপনার? আপনি ফয়সালা করবেন যে সেই জিনিসটার আসলে অস্তিত্বই নেই। তাই না? সেই হিসেবে, আবারও হাইপোথেটিক্যালি, লোকটার আসলে অস্তিত্বই নেই। এই কারণেই, কিংবা হয়তো এই রকমেই, এই মুহূর্তে আপনার কিছুই ভাল লাগছে না। অনেক আরাম পাওয়া যেত যদি লোকটা কখনো না থাকত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে আপনার কাছে এমন কিছু ক্লু আছে যাতে মনে হয় ওই নামে একটা লোক ছিল। অথবা একটা সত্তা ছিল যা কিনা এমনকিছু তৈরি করতে সমর্থ ছিল যাতে কিছু লোকের কাছে ওই নামে একটা মুখাবয়ব ধরা পড়ে, অধিকন্তু কিছু শব্দমালা যা কিনা ওই লোকের কথাবার্তা হিসেবেও ভাবা হয়।

এসব কিছুর সূচনা হয়েছিল একটা সাধারণ জিজ্ঞাসা থেকে। একটা সাধারণ জিজ্ঞাসা হাশেমী যা রেখেছিলেন। 'আপনারা সবাই আফগানিস্তানকে কেবল বুদ্ধ ভাঙা দিয়ে চেনেন কেন এবং আফগানিস্তানের দুর্দশা দিয়ে কেন চেনেন না?' তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হয়তো তিনি এই প্রশ্নটা একটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত আর শব্দনিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স ঘরের শ্রোতাদের কাছে রেখেছিলেন। এবং এটা বোঝা যায় যে এই জিজ্ঞাসার কিছু নির্দিষ্ট ভিত্তি ছিল। যেমন: 'আপনারা সবাই অজ্ঞ যে আফগানদের দুর্দশা তাঁরা নিজেরা ডেকে আনেননি বরং তাঁদের উপর এগুলো ব্রিটিশরা, তারপর রাশানরা, আরো পরে আমেরিকানরা আশীর্বাদ হিসেবে দিয়েছে।' কিংবা ধরা যাক, 'জাতিসংঘ কিংবা আনান সাহেব বড়জোর পাছা-চাটা।' যেমনটা বললাম, হয়তো তিনি জিজ্ঞাসাটা রেখেছিলেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও শব্দনিয়ন্ত্রিত একটা কনফারেন্স ঘরের শ্রোতৃমÉলীর কাছে। কিন্তু সেই ছোট্ট ঘরখানা থেকে প্রশ্নটা বাইরে চলে এসেছিল চটজলদি। এবং মানুষজন, বিশেষতঃ সভ্যবিশ্বের মিডিয়াভোক্তারা খুবই মুষড়ে পড়েন একজন তালিবানকে যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা বলতে দেখে। কারণ বছরের পর বছর সেসব মানুষ বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে মুসলমানরা যুক্তিশীল কথাবার্তা বলে না। ফলে অসন্তোষটা শুরু হয়।

আপনি একজন সিরিয়াস ব্রাউজার এবং আপনি এই ভাষ্য ইন্টারনেটে খুঁজে পেলেন। একজন তালিবান রাষ্ট্রদূত ২৪ বছর তাঁর বয়স। আপনি জানলেন। আপনি তাঁর একটা ছবিও দেখলেন। এবং আপনিও মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু সেটা তিনি তালিবানপক্ষীয় বলে নয়, বরং আপনি ভাবলেন যে তাঁর কিছু জরুরি যুক্তি আছে যেগুলো চাপা পড়ে যাচ্ছে। হতে পারে যে আপনি নিজেও সেই অসভ্য বিশ্বের একজন প্রজা বলে এমনটা হয়েছে। এবং আপনি আপনার পক্ষে সম্ভব সব চেষ্টা করলেন যাতে আপনার মানুষজনের মাঝে হাশেমী শ্রুত হন। আপনি তাঁর শব্দাবলি অনুবাদ করলেন, ছবিটা অনুবাদ করা লাগল না কারণ সেটা এমনিতেই পড়া যায় ।

এখন আপনি আপনার কম্প্যুটারের সামনে বসে। আপনার নিজের ভাষায় হাশেমীর কথামালা। আর আপনি সম্ভাব্য শ্রোতা খুঁজে চলেছেন। এরই মধ্যে অথচ, বোমারু বিমানবাহিনীর পয়লা দল আফগানিস্তান পানে রওনা হয়ে গেছে। সেসব বিমানের শব্দে আপনার মনোসংযোগ হচ্ছে না। আর আপনি আপ্রাণ খুঁজে চলেছেন আপনার আশপাশের মানুষজনকে। ওই বিমান আর বারুদের শব্দের বদলে আপনি চাইছেন ওই শব্দমালা শ্রুত হোক।

তারপর আপনার কাজ সেরেই কেবল, আপনি রাস্তায় এলেন। জনজগৎ। আপনি দেখলেন লোকে আপনার উপরে ভীষণ ক্রুদ্ধ। তার মানে আপনার অনূদিত শব্দমালা তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট কেন?

কিছু আগে বা পরে, আপনি বুঝে গেলেন যে এখন এবং এর পর থেকে আপনি হাইপোথেটিক্যালি একজন তালিবান। যেহেতু দুনিয়ার সকলেই, সভ্যবিশ্ব থেকে হোক বা অসভ্যবিশ্ব থেকে, মুসলিম জমানার বাজে দিক নিয়ে জানেন। আপনি আসলে তাঁদের জীবনের মহত্ত্বকে লঙ্ঘন করেছেন। এবং হাশেমীকে ইদানীং অনেক নিয়মিত ভাবেন আপনি।

বোমা চলতে থাকল। বোমা চলতে থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল ততক্ষণই।

কাবুলগামী একটা প্লেনে চড়ে, আপনি এখন জানেন যে অন্ততঃ একজন তালিবান আছেন, বা ছিলেন, যিনি যুক্তিসঙ্গত। এবং আপনি হয়তো কখনোই তাঁকে আর শুনতে পাবেন না। এবং তবুও জানালার বাইরে আপনি তাকিয়ে আছেন। আপনি পেশওয়ার বিমানবন্দরের রানওয়েতে নেহায়েৎ ফাটলগুলো দেখতে থাকেন। হলুদ মোড়কে আপনাকে কিছু ক্যান্ডি দেয়া হলো। আপনি বিমানবালার মুখের দিকে চাইলেন। স্মিত হাস্যে ভরা তাঁর মুখ। এবং তিনি হেসে আপনাকে নিশ্চিত করলেন এগুলো ক্যান্ডিই, আর কিছু নয়।

পাইলট ইঞ্জিন চালু করলেন তখন।

কৈফিয়ৎ:
বিশ্বাস করুন, আমি একটা গল্প লিখতেই চেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে তা হয়নি। কিন্তু এর থেকে ভাল কিছু করা আমার সম্ভব ছিল না। কারণ **আপনার** সঙ্গে আমার কোনো এক প্রান্তে দেখা হয়েছিল। এবং আপনাকে নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমি। অথবা আপনি হতে পারেন এমন কারো সঙ্গে, কিংবা এমনকি হাইপোথেটিক্যাল আপনার সঙ্গে। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে কোনো গল্প পাচ্ছেন না? হয়তো সত্যিই পাচ্ছেন না। ঠিক আছে, তাহলে একটা বিশাল গল্প আসছে সামনে। সেটার জন্য বরং অপেক্ষা করুন। গল্পটা আমি জানি না, কিন্তু নামটা বলতে পারি: "বম্ব দেম টিল দ্য লাস্ট ভয়েস হার্ড!"

(রচনা ১০ ডিসেম্বর ২০০৫, বাংলাকরণ ০৪ জানুয়ারি ২০০৭)

শুয়ে থাকার কাল

টিকটিকিটার দিকে আপনি না তাকালেও পারতেন। ধরুন ঠিক যে মুহূর্তটিতে আপনার চোখ ওখানে পড়তে যাচ্ছিল, তার ক্ষণিক আগেই সেটা আপনি টের পেয়েছেন। পাবার কথা। এরকমই হয়। একটা বৃহত্তর দৃকবলয় অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে আপনাকে জানান দিতে থাকে সম্ভাব্য আলোকসম্পাতকৃত পরবর্তী বস্তুটির কথা। হ্যাঁ, আলোকসম্পাত। নাহলে তো আপনি দেখেনই না। আর আপনার অতিদ্রুত মস্তিষ্ক-বার্তাটা যেভাবে আপনাকে সক্রিয় করেছিল, তাতে দৃকপাতের, মানে আলোকনিবন্ধ হবার ঠিক.. ঠিক... ঠিক পূর্বমুহূর্তে আপনার চোখকে নিবৃত্ত করা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল। সেটাই হবার কথা। এভাবেই হয়। ফলে এই দৃকপাতটি আপনার ইচ্ছাকৃত। মানে দাঁড়ায়, আপনি টিকটিকিটাকে দেখতে চেয়েছেন। প্রবৃত্ত হয়েছেন। হয়তো কৌতূহলী, বা অনুসন্ধিৎসু। এমনকি হয়তো উদ্যমী বা প্রলুব্ধ।

কিন্তু এটা প্রায় নিশ্চিত যে এই পর্যন্ত এসে আপনি এই বিবরণীতে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বেন। আপনি কিছুতেই নিশ্চিত বা নিঃসংশয় হতে পারবেন না যে ঠিক এভাবেই ঘটেছে কিনা। কিংবা আপনি হয়তো চাইবেন না নিশ্চিত হতে। দৃকপাতের যে কর্তৃত্ব আসলে আপনার ছিলই, সেটা, সংশয়বশতঃ, আপনি অস্বীকার করতে চাইবেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে সংশয় নয়, এখানে অস্বীকার করাটা একটা চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া। সারাংশ হচ্ছে, আপনি দাবি করবেন যে টিকটিকিটাকে আপনি দেখতে আসলে চাননি। এই দৃকপাত ইচ্ছানিরপেক্ষ। ঘটনাচক্রীয়। দৈবাৎ। আপনার এই দাবির সবচেয়ে জোরাল দিকটা হলো এই যে আপনি ঠিক তারপরই বমি করতে শুরু করেছেন। সেধে সেধে আপনি বমি করতে চাইবেন না এ কথা সর্বসাধারণ্যে প্রমাণ করার জন্য কসরৎ করতে হবে না। এভাবে আপনার ইচ্ছাসাপেক্ষ ও ইচ্ছাকৃত ক্রিয়াটি কিন্তু একটা দুর্ঘটনা হিসেবেই প্রমাণিত হলো।

কিন্তু আধখাওয়া তেলাপোকাটির কথা ধরা যাক। এমন তো হতেই পারত যে ওই অর্ধেক তেলাপোকাটি, যদি জীবন্ত প্রাণীর ভণিতা না-করে রওনা না-

হতো, মানে যদি রওনা হবার উদ্‌যোগ না নিত, তাহলে আপনি বমি করতেন না হয়তো। সেদিক থেকে দেখলে আপনার থেকে অনেক অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকার কথা টিকটিকিটার। ওর অভিজ্ঞতাতে এরকম কোনো ঘটনা থাকবার সম্ভাবনা একেবারেই কম যে কিছু একটা খেতে শুরু করবার পর সেই সন্দেহাতীত খাদ্যটি জীবন্ত হয়ে দৌড়ুতে চেষ্টা করবে। আবার টিকটিকিটার পক্ষে তেলাপোকাটির পিছন দিকের আধখানা বা পোয়াটেক মুখে-পোরা অবস্থায় বমি করাও অসম্ভব ছিল, যেটা আপনি করছেন। এ কথা ঠিকই যে টিকটিকিরা বমি করে কিনা এ বিষয়ে সকলের জানাশোনা কম। তাবলে তারা বমি করে না এমন সিদ্ধান্তে আসারও কোনো কারণ নেই। এমন তো হতেই পারে যে টিকটিকিটা বমি করছিল না নেহায়েৎ এই আতঙ্কে যে তেলাপোকার পশ্চাৎ অংশটিও মুখ থেকে নিস্কৃত হয়ে সার্বভৌম দৌড়াদৌড়ি করবে। যাই হোক, টিকটিকিটা আপনার থেকেও অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও আপনার ছিল না। তাছাড়া দৃকপাতের পুরো বিষয়টি, যাই প্রমাণিত হয়ে থাকুক না কেন, আসলে আপনার ইচ্ছাহেতুই ছিল।

ফলতঃ তেলাপোকাটি, আপনি আধখাওয়া কিংবা পোয়াখাওয়া তাকে দেখে বমি করতে লাগার পর, আপনাকে একান্ত সহমর্মী ভাবে। এর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই যদিও। তবুও ও ভাবে। এবং ও প্রাণপণ আপনার দিকে দৌড়াতে থাকে। আর আপনি ততক্ষণে বমি থামিয়েছেন একদফা। আর আপনি কিছুতেই চাইছেন না ও আপনার দিকে আসুক। আর তাই আপনি আবার বমি-উন্মুখ হয়ে উঠছেন। এ দফা আপনি নিজের বুক ভাসালেন শুয়ে শুয়ে। কিন্তু আধা-তেলাপোকাটি আপনার শায়িত ডান উরু বরাবর আসছে। আসছেই। এবং দ্রুত। আর আড়চোখে আপনি তা দেখছেন। আপনি আবার বমি করলেন। দেয়াল বেয়ে ঠিক তখনই হাঁচড়-পাঁচড় তেলাপোকাটা আপনার ডান উরুতে আছড়ে পড়ল। আর আপনি একটা প্রবল ঝটকায়, চাইলেন, উরু থেকে তাকে হঠিয়ে দিতে। আপনি পা ঝাড়া দিলেন। মানে দিতে চাইলেন। এটা সম্ভবতঃ আপনার ইচ্ছাপ্রসূত প্রক্রিয়া। কোমড়ের নিচে পাছার মাংসপেশী শক্ত হলো। মুখে বমি সমেত আপনি কিছু একটা আওয়াজ করছেন। অথচ নিচে কিছুই নড়ল না। আর ঠিক সেই... সেই... ঠিক সেই মুর্হর্তে আধা-তেলাপোকাটা বিছানার চাদরের উপর পড়ল, যেখানটাতে আপনার উরু, মানে উরু জোড়া, থাকার কথা ছিল।

হতে পারে যখন আপনি অজ্ঞান ছিলেন বলে সবাই ভেবেছিল, তখন আপনি মোটেই অজ্ঞান ছিলেন না। হয়তো আপনি সবকিছু দেখেছেন। একটা একটা করে দুটো উরুই কেটে নেয়া। হতে পারে সেজন্যই টিকটিকিটার দিকে তাকাতে আপনি কৌতূহলী হয়েছিলেন, কিংবা অনুসন্ধিৎসু। কিংবা প্রলুব্ধ। হতে পারে এই তেলাপোকাটার সঙ্গে যুগল বেঁধে গন্তব্যে আপনি যেতে চান না। কিন্তু আধা-তেলাপোকাটা আপনার যেখানে উরু থাকার কথা ছিল সেখানে রক্তের মধ্যে আটকে গেছে।

আর আপনি বমি করছেন। আবারও।

জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট হাসপাতালের ৭ নং ওয়ার্ড॥ ২৮শে আগস্ট ২০০৮ সারারাত্রি

আয়নাতে নিজের মুখটা...

কবে কোথায় যেন তুমি শুনেছিলে এরকম আয়নাও আছে যেটার সামনে দাঁড়ালে এমনকি নিজের মুখটাও দেখতে পাওয়া যায় না। পাশে-থাকা লোকটিকেও অবিকল দেখা যায় তার ভিতরে। কেবল তোমাকেই দেখা যায় না। তুমি শুনেছিলে, কিন্তু সেরকম একটা আয়না তোমার নেই। এমনকি তুমি তা দেখনি কখনো। কখনো দেখবে সেই আকাঙ্ক্ষাও স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়নি কোথাও। কখনো একান্ত কোনো লিপ্সার গহ্বরে বসে তুমি যে পত্রগুলো লিখেছিলে, হয়তো প্রেমপত্রই বলে, সেখানেও জাদুকরী সেই একটা আয়নার আব্দার কখনোই তুমি করনি। কারো কাছেই। করনি; হয়তো নিজেকে আয়নায় না-দেখতে তোমার ভাল লাগবে না এই ভেবে। কিংবা আরও সরল কারণ হয়তো। হয়তো একারণে যে নিজেকে দেখতে পাওয়া যায় এমন সকল আয়নাই তোমার পছন্দ ছিল।

তারপরও এখন তুমি তোমার নিজেকে দেখছ না। আয়নায় তোমার নিজের মুখটা দেখতে হলে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে আয়নার সম্মুখটাতে দাঁড়াতে হবে। তা তুমি করছ না। আরও খানিকটা এগিয়ে এলে আসলে আমারও আরো খানিক কাছে-আসা হয় তোমার। তাও তুমি এগিয়ে আসছ না। তুমি তোমাকেও দেখছ না আয়নাতে।

...তুমি দেখছ আমাকে।

আয়নার এ এক খেলা যে তুমি তোমাকে নয়, দেখতে পার কেবল আমাকেই। সত্যি কথা বললে আমিও দেখতে পাই তোমাকে। বাইরে একটা জ্যান্ত আমাকে রেখেও আয়নাতে আমাকে দেখতে-থাকা উত্তেজনাকর এক অনুশীলন। তুমি দেখতে দেখতে টের পেতে থাকো। এক প্রগাঢ় উত্তেজনা। তখন আমরা আয়নাটাকে উছিলা করে তীব্র কাঙ্ক্ষার সেতুবন্ধ গড়ি। সেতুটা নিয়মমাফিক সরলপথে চলে না, বরং কৌণিক হতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আয়নাটা নিছক নিমিত্ত হয়েও উদ্ভাসিত হয়ে বিরাজমান থাকে। ঝুলন্ত, কিন্তু ভয়ানক নিশ্চিত।

ফলে আমরা—যদিও তুমি আবিষ্কারক, প্রস্তাবক কিংবা রূপকার—কাঙ্ক্ষার অনুশীলন করে চলি। কাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হই। লিপ্সার কাঙ্ক্ষা করি। আমরা অপাঙ্গ হানি, ভ্রুকুটি করি। উন্মুল হই, আবার লিপ্ত হই, প্রোথিত হই। টেটম্বুর স্নাত হই। আবারও উন্মুল ও চূর্ণ হই। আয়না আমাদের কৌণিক সেতু হলেও স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকে।

আমরা...
উন্মুল হই।
লিপ্ত হই।
প্রোথিত হই।
স্নাত হই।
চূর্ণ হই।

কামনাভারে আমাদের শরীর ও আত্মা, কিংবা হয়তো মস্তিষ্কের কোষরাজি, টনটন করতে থাকে।

আয়নাতে পরস্পর দ্রবীভূত হয়ে গেলে, তোমার মনে পড়ে বাইরে একটা জীবন্ত আমি আছি, কিংবা ছিলাম। তোমার মনে পড়ে আয়নারা প্রচ্ছায়া আর প্রতিবিম্বের রাজ্য। তোমার এই জ্ঞানও পর্যালোচিত হয় যে প্রচ্ছায়ারা কখনোই বস্তুরাজি নয়। এই স্মৃতিও তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে এইসব আয়নাবাজি-কাঙ্ক্ষার ক্রীড়া শুরু হয়েছিল কোনো এক আদিকালে। আর তুমি এর আবিষ্কারক। তোমার নিমন্ত্রণ হেতু আমি এই আয়নারাজ্যে। দ্রবীভূত যদিও, আমি আহ্বান করিনি। কিংবা করেছিলাম কিনা সেই স্মৃতি কোনোখানে নাই। ফলে তুমি আয়নার দ্রবণ থেকে চকিত চোখ সরালে। তুমি, আমি যেখানটাতে জীবন্ত স্থাপিত ছিলাম, সেখানটাতে তাকালে। তোমার কামনা-ভ্রুকুটি অপসৃত।

কিন্তু আমাকে আর দেখতে পেলে না।

যে বাসটা ঠিক তার আগের মুহূর্তেই সৌর-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে, আমি তাতে অনিচ্ছুক সওয়ার হয়ে গেছি। কিংবা হয়তো ইচ্ছুক সওয়ার। এমনও

হতে পারে যে ইচ্ছুক বা অনিচ্ছুক কিছুই না। আমি ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ সওয়ার। কিন্তু বাসটা ততক্ষণে সৌর-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। আর আমার দিকে তাকানোর, মানে আমি যেখানটাতে স্থাপিত কিংবা অধিষ্ঠিত ছিলাম সেইখানটাতে আমায় দেখবে বলে তোমার তাকানোর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাসটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ডিঙিয়ে গেল।

এ কথাটাও তোমার নিছক শোনা-কথাই যে মাধ্যাকর্ষণের বাইরে গেলে এমনকি তার প্রচ্ছায়া আর প্রতিবিম্বও থাকে না। হয়তো তাই। হতেও তো পারে যে আলোকরশ্মিরও ওজন আছে। শুধু মানুষ সেটা জানে না। ফলে, তুমি আবারও আয়নায় তাকালে। এদফা সন্ত্রস্ত, আর পারলৌকিক উৎকণ্ঠা সমেত। তাকালে, আবার তাকানোর আগে এক মহাকাল অপেক্ষা করলে। তাকালে, অন্তত এই ভরসাতেও যে আয়নাতে আমার মুখটা দেখা যাবে।

আর আমি তখন সপ্তম আকাশের ঠিক সামনের দরজায়। সপ্তম আকাশে কি প্রতিবিম্বলুপ্ত সেই আয়না পাওয়া যাবে?

এ্যাডাব গেইস্ট হাউজ, লালমাটিয়া; মোহাম্মদপুর॥ ২৭শে নভেম্বর ২০০৮
সারারাত্রি; ৩০শে নভেম্বর ২০০৮